গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ১৫ সংখ্যা ১৮ - ২৪ নভেম্বর, ২০০৫ প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার, ফসলের ন্যায্য দাম, খেতমজুরদের সারা বছরের কাজের দাবিতে

কৃষক ও খেতমজুরদের আইন অমান্য

এ আই কে কে এম এস-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির নেতৃত্বে কৃষি বিদ্যুতের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম, ক্ষেতমজুরদের সারা বছরের কাজ ও ন্যায্য মজুরির দাবিতে এবং দেশি-বিদেশি শিল্পপতিদের কৃষি জমি উপঢৌকন দেওয়ার রাজ্য সরকারের নীতি প্রতিরোধে ১৪ নভেম্বর কলকাতার রানী রাসমনি রোডে কৃষকরা আইন অমান্য করেন। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন এস ইউ সি আই দলের বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার এবং সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

আইন অমান্যের আগে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে বিভিন্ন

দুয়ের পাতায় দেখুন

ভোলকার রিপোর্ট — কংগ্রেস, সিপিএমের দেউলিয়া রাজনীতি

রাষ্ট্রসংঘ নিযুক্ত ভোলকার কমিটির রিপোর্টে কংগ্রেস দল এবং অধুনা অপসৃত বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংহের বিরুদ্ধে তেল ঘুষ কেলেঙ্কারীতে গোপন আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে। সংবাদে প্রকাশ, ইরাকি তেল বিক্রি সংক্রান্ত দুর্নীতি চক্রের সঙ্গে জড়িত থেকে নটবর সিংহ ও কংগ্রেস দল অসদুপায়ে প্রচুর টাকা করেছে।

'৯১ সালে প্রথম ইরাক যুদ্ধের পর মার্কিন সমরচক্র ইরাকের আমদানি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে অবরোধ জারি করে, যা কোনও দেশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র হানার চেয়েও ভয়ঙ্কর। রাষ্ট্রসংঘের বকলমে জারি করা মার্কিন অবরোধের ফলে শুধু শিশুখাদ্য ও ওষুধ আমদানি করতে না পারায় লক্ষাধিক ইরাকি শিশু মারা যায়। এছাড়াও অত্যাবশ্যক জিনিসপত্র আমদানির অভাবে ইরাকে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মার্কিন আর্থিক অবরোধ বাস্তবে গণহত্যার হাতিয়ারে পরিণত হয় এবং এর বিরুদ্ধে বিশ্বজোড়া প্রতিবাদ ফেটে পড়ে। খোদ আমেরিকার মাটিতে প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল র‍্যামসে ক্লার্ক, বিশ্বখ্যাত বুদ্ধিজীবী নোয়াম চমস্কি সহ অগণিত মার্কিন নাগরিক ও যুদ্ধবিরোধী সংগঠন ইরাকে মার্কিন সমরচক্রের অমানবিক অবরোধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঘরে-বাইরে প্রবল বিরুদ্ধ জনমতের চাপে মার্কিন সমরচক্র 'তেলের বদলে খাদ্য' প্রকল্প চালু করে, যার আওতায় ইরাককে নির্দিষ্ট পরিমাণ তেল বিক্রি করে অত্যাবশ্যক কিছু দ্রব্য আমদানির অনুমতি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘ রপ্তানিযোগ্য ইরাকি তেলের দাম বাজারদরের নিচে বেঁধে দেয় এবং তেল বিক্রির সমস্ত টাকা মার্কিন পর্যবেক্ষণের আওতায় বিদেশি ব্যাঙ্কে রাখা বাধ্যতামূলক করে। তার উপর ইরাক যাতে কোনমতেই বেশি তেল রপ্তানি করতে না পারে সেজন্য অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী সমস্ত জাহাজে তল্লাসি চালানোর জন্য ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির নজরদার জাহাজ দিয়ে ইরাককে ঘিরে রাখা হয় এবং নজরদারির খরচের নামে বিপুল টাকা ইরাকের কাছ থেকে আদায় করা হয়। বাস্তবে 'তেলের বদলে খাদ্য'-এর নামে ইরাকের তৈলসম্পদ লুঠ করা হয়।

বিভিন্ন তেল কোম্পানিই শুধু নয়, রাজনৈতিক প্রভাবের জোরে অনেক নেতা-মন্ত্রীই এই সস্তা তেলের কোটা সংগ্রহ করে। যারা ব্যবসায়ী নয়, তেমন সুবিধাভোগী নেতারা কোটার তেল অন্য ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে কোটি কোটি টাকা কামায়, এদের মধ্যেই রয়েছে নটবর সিংহের নাম। ভোলকার কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে, নটবর সিংহ কোটার তেল তুলেছিলেন এবং তাঁর পুত্রের বন্ধু অ্যান্ডালিব সেহগলের হামদান এক্সপোর্ট কোম্পানিকে বেচে বিপুল পরিমাণ লাভ করেছেন। কেবল নটবর সিংহই নয়, অভিযোগ উঠেছে কংগ্রেসে দল ও সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধেও। নটবর সিংহ অবশ্য বলেছেন, তিনি নির্দোষ। প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, তালিকায় নাম থাকলেই তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। তবুও সরকারের পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির খাতিরে নটবর সিংহ পদত্যাগ করেছেন বলে বলা হচ্ছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ভোলকার রিপোর্টের সত্যাসত্য নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে এ-বিষয়ে তদন্ত করার জন্য

চারের পাতার পর

ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়ার প্রতিবাদে কলকাতায় বিক্ষোভ

কলাইকুণ্ডায় ভারত-মার্কিন যৌথ বিমান মহড়ার প্রতিবাদে ১২ নভেম্বর কলকাতায় বিক্ষোভ ও রাজ্যপালের কাছে ডেপুটেশন

অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের উদ্যোগে

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী কনভেনশন

২৪ নভেম্বর, সকাল ১০টা, মহাজাতি সদন, কলকাতা

দেশের ও বিদেশের বিশিষ্ট প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন

মালদহ

কালিয়াচকে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

মালদা জেলার কালিয়াচকের লক্ষাধিক মানুষ বিড়ি শ্রমিক। এই বিড়ি শ্রমিকদের ৯৯ শতাংশই মহিলা। তারা দীর্ঘদিন ধরে বিড়ি মালিক ও কন্ট্রাক্টরদের দ্বারা শোষিত ও বঞ্চিত। সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রতি হাজার বিড়িতে ৭১·৯৫ টাকা। কিন্তু বিড়ি শ্রমিকেরা ন্যূনতম মজুরির অর্ধেকেরও কম পান। যেখানে আইন অনুসারে হাজারে দুই মুঠার বেশি বিড়ি ছাঁট করা যায় না, সেখানে কন্ট্রাক্টররা ইচ্ছামতো ৮-১০ মুঠা ছাঁট করে। ছাঁট বিড়ির মজুরি শ্রমিক পায় না, কিন্তু বাজারে সেই বিড়ি বিক্রি করে মালিকরা অধিক মুনাফা লাভ করে। সাপ্তাহিক মজুরি দেওয়ার সময় শ্রমিকের মজুরি থেকে ৩ থেকে ৫ টাকা কেটে নেয় কন্ট্রাক্টররা, এর সঙ্গে পাতা-মশলা কম দিয়েও পরিমাণ মতো বিড়ি বুঝে নেয় (ফলে শ্রমিককে বাজার থেকে পাতা মশলা কিনে বিড়ির সংখ্যা পূর্ণ করতে হয়)। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ওজনে কম দেওয়া, পি-এফ এর টাকা জমা না দেওয়া, হয় কথায় নয় কথায় শ্রমিক ছাঁটাই করা, এক জায়গার কারখানা অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য করা ইত্যাদি। এমন হাজারো পদ্ধতিতে বিড়ি-শ্রমিকদের ওপর শোষণ, বঞ্চনা ও অত্যাচার চালানো হয়। গত আগস্ট মাসে কেবলমাত্র মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট হয় অসংগঠিতভাবে কিছু শ্রমিক সংগঠনের ডাকে। একমাস ব্যাপী শ্রমিকদের আত্মত্যাগ সত্ত্বেও শ্রমিকদের না জানিয়ে সিটু, আই এন টি ইউ সি ও মালিকপক্ষ একজোট হয়ে শ্রমিকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে ৪০·৮০ পয়সা মজুরির চুক্তি করে। তারা ন্যূনতম মজুরির আইনকেও তোয়াক্কা করেনি। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই সামান্য মজুরিটুকুও কার্যকরী করার দায়িত্ব সরকার, মালিক বা উক্ত ইউনিয়নগুলি নেয়নি। পাশাপাশি মালিক ও কন্ট্রাক্টর কর্তৃক বিড়ি শ্রমিকদের শুষে নেওয়ায় মদত দিচ্ছে স্থানীয় সরকারি দলের নেতারা।

কালিয়াচকে বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের একাংশ

ইউ টি ইউ সি-এল এস অনুমোদিত মালদা জেলা বিড়ি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের ডাকে বিড়ি কারিগরদের মালিক ও কন্ট্রাক্টর কর্তৃক শোষণ ও কিছু শ্রমিক ইউনিয়নের বিড়ি শ্রমিকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদে আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্য গত ৬ নভেম্বর গোপালগঞ্জের বাবুরসোনা হাইমাদ্রাসায় কালিয়াচক বিড়ি শ্রমিক সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশনে দুই সহস্রাধিক শ্রমিক যোগ দেয়। শ্রমিকরা যাতে সম্মেলনে আসতে না পারে সেজন্য কংগ্রেস, সিপিএম, ফরওয়ার্ড ব্লক, বিজেপি প্রভৃতি রাজনৈতিক দল সম্মেলনের বিরুদ্ধে প্রচারে নামে। এই সমস্ত দলের গণসংগঠনগুলির এবং স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মিটিং গ্রামে গ্রামে ডাকানো হয়, কন্ট্রাক্টররা সকাল বেলা থেকেই বেশির ভাগ গ্রামে বিড়ি নিতে ও পাতা তামাক ছাড়তে চলে আসে সম্মেলনের দিনে। এত করেও শ্রমিকদের সংগ্রামী মন ও আন্দোলনের শক্তিকে তারা রুখতে পারেনি।

এই সম্মেলনে বক্তা হিসাবে উপস্থিতি ছিলেন ইউ টি ইউ সি-এল এস-এর মালদা জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড গোপাল নন্দী, বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের রাজ্য সভাপতি কমরেড আব্দুস সঈদ ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড অশ্বিনীকুমার মণ্ডল।

সম্মেলনে কমরেড আব্দুস সঈদ শ্রমিক জীবনের দুর্দশা বর্ণনা করে গ্রামে গ্রামে কমিটি গঠন করে আন্দোলনকে সংগঠিত রূপ দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শ্রমিকদের যেকোন আন্দোলনের সামনে দাঁড়িয়ে পুলিশ ও কায়েমীস্বার্থবাদীদের লাঠি-গুলির মোকাবিলা করে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার সংগ্রাম করে যাবে আমাদের ইউনিয়নের নেতারা, কর্মীরা। এই মালিকী শোষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে দেশের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। তাই শ্রমিক আন্দোলনকে পুঁজিবাদবিরোধী চেতনা ও সংস্কৃতির উপর দাঁড় করিয়ে এই শাসন-শোষণ উচ্ছেদের আন্দোলনের সঙ্গে মেলাতে হবে।

প্রতিনিধি সম্মেলনের পর বিড়ি শ্রমিকদের সুসজ্জিত মিছিল গোপালগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে প্রকাশ্য সম্মেলনে যোগ দেয়। বহু সাধারণ মানুষও মিছিল ও প্রকাশ্য সমাবেশে যোগদান করেন। অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে নেতৃবৃন্দের বক্তব্য তাঁরা শোনেন।

এই সম্মেলন থেকে কমরেড মোফিজুদ্দিন মোল্লাকে সভাপতি ও কমরেড জন্মেজয় সরকারকে সম্পাদক করে ৬৭ জনের মালদা জেলা বিড়ি শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়নের কালিয়াচক শাখা গঠিত হয়।

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর নদিয়া জেলা সম্মেলন

৬ নভেম্বর কৃষ্ণনগর হাইস্কুলে 'কমরেড মিলন মজুমদার নগরে' ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী'র নদিয়া জেলা ১ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিড়ি, তাঁত, রিক্সাভ্যান, ছুতোর, রাজমিস্ত্রী, পরিচারিকা, রেল সহ সরকারি-বেসরকারি অফিস কর্মচারী ও রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের পার্ট টাইম সুইপার সহ বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত দেড় শতাধিক প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। প্রস্তাবের সমর্থনে ১২ জন প্রতিনিধি আলোচনা করেন। এই সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি এস ইউ সি আই জেলা সম্পাদক কমরেড সেখ খোদাবক্স। প্রধান বক্তা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সহ-সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য শ্রমজীবী মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের নগ্ন আক্রমণের চিত্র তুলে ধরে বলেন — সিটু, আই এন টি ইউ সি ইত্যাদি বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়নগুলি যখন শ্রমিক কর্মচারী বিরোধী চুক্তি করে মালিকের দালালি করে চলেছে, তখন সর্বহারার মহান নেতা ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর পথ প্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় আমাদের এই সংগঠনই শ্রমিক কর্মচারীদের বাঁচার পথ দেখাচ্ছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ পাওয়ার মেন্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিন্‌হা। সভাপতিত্ব করেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুজিত ভট্টশালী। কমরেড কেষ্ট চৌধুরীকে সভাপতি ও কমরেড প্রবীর দে-কে সম্পাদক করে ১৩ জনের জেলা কমিটি গঠিত হয়।

কোচবিহারে বিড়ি শ্রমিকদের ডেপুটেশন

কোচবিহার জেলার বিড়ি শ্রমিকরা বিগত বছরগুলির মত এবছরও পুজোর সময় বোনাস পাননি। কাজে স্থায়ীকরণ, মজুরিবৃদ্ধি, পিএফ প্রকল্প থেকেও বঞ্চিত এ জেলার শ্রমিকরা। স্বাস্থ্য, বাসস্থান, শিক্ষাসহ সামাজিক সুরক্ষা বিষয়ক প্রকল্পগুলি কার্যকরী করারও তেমন উদ্যোগ নেই। ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা ২৭ অক্টোবর সংগ্রামী বিড়ি শ্রমিক ইউনিয়নের নেতৃত্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন দেন। তাদের দাবি — (১) অবিলম্বে বিড়ি শ্রমিকদের পরিচয়পত্র দিতে হবে, (২) নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রমিককেই এক হাজার বিড়ি প্রতি ন্যূনতম ১০০ টাকা মজুরি দিতে হবে, (৩) কনট্রাক্টর, সাব-কনট্রাক্টর, পেটি কনট্রাক্টর, মুন্সি, এজেন্ট, পাট্টাদার ও ছদ্মবেশী বিক্রেতার অধীনে কর্মরত সমস্ত শ্রমিককে মূল মালিকের প্রত্যক্ষ ও নিয়মিত কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে, (৪) মালিক ও শ্রমিকের মধ্যবর্তী স্তরে বিভিন্ন নামে কর্মরত ব্যক্তিদের মূল মালিকের কর্মচারী হিসাবে গণ্য করতে হবে, (৫) প্রতিটি শ্রমিকের লগবুক পাওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে, (৬) বিড়ি শিল্পে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের সরকারি সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে, (৭) সমুন্নত গৃহনির্মাণ প্রকল্পের জন্য ভূমিহীন শ্রমিকদের বসতবাড়ি ক্রয় সহ গৃহনির্মাণের অনুদান দিতে হবে। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সম্পাদক নৃপেন কার্যী, অনিলচন্দ্র বর্মন রায় ও অনিমা বর্মন।

১১ নভেম্বর এ আই ডি এস ও কলকাতা জেলা কমিটির মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন

কৃষক ও খেতমজুরদের আইনঅমান্য

একের পাতার পর

জেলা থেকে প্রায় দশ সহস্রাধিক কৃষক সমবেত হন। সুবোধ মল্লিখ স্কোয়ারে এক সংক্ষিপ্ত সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট জননেত্রী ও এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যা কমরেড প্রতিভা মুখার্জী। তিনি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সুশৃঙ্খলভাবে আইন অমান্যে অংশগ্রহণ করার জন্য আগত কৃষকদের আহ্বান জানান। তিনি বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত কৃষকদের উপর নির্মম অত্যাচার চালানোর প্রতিবাদ জানান। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড খোদাবক্স ও কমরেড শঙ্কর ঘোষ। মিছিল নির্মল চন্দ্র স্ট্রীট, এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে রানী রাসমণি রোডে পৌঁছায়। আগে থেকেই র‍্যাফ সহ সশস্ত্র বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। নিরস্ত্র কৃষকদের শান্তিপূর্ণ আইন অমান্যে এই বিপুল পুলিশি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

সিপিএম শাসনে

পুলিশে ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের ধারাই চলছে

রাজ্য পুলিশের এনফোর্সমেন্ট বিভাগের আই জি নজরুল ইসলাম, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ নন-গেজেটেড পুলিশ কর্মচারী সমিতির মুখপত্র 'মঙ্গলপথ'-এর শারদ সংখ্যায় রাজ্যের পুলিশ বিভাগের উপর নিবন্ধ প্রকাশ করে কিছুটা আলোড়ন ফেলে দিয়েছেন। কয়েকটি সংবাদপত্রে তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতও করা হয়েছে। এই লেখাটি নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হওয়ার কারণ, রাজ্য পুলিশেরই একজন পদস্থ অফিসার হয়ে তিনি যেভাবে পুলিশ- বিভাগের অপকর্ম, দুর্নীতি, বিশেষত শাসকদলের দাসানুদাস হিসাবে পুলিশের আচরণ নিয়ে খোলাখুলি বলেছেন, ইতিপূর্বে এই রাজ্যের কোন পুলিশ অফিসার এমন সাহস দেখাতে পারেননি। লেখায় এমন বহু বিষয়ই তিনি এনেছেন, যা এ রাজ্যের জনগণের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে যায়। কিন্তু জনগণ নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকে পুলিশ ও শাসকদল সম্পর্কে যা জানেন ও অভিযোগ তোলেন, একজন কর্মরত পুলিশ অফিসারের কলম দিয়ে যখন সেই অভিযোগগুলি প্রকাশ পায়, তখন তার গুরুত্ব বেশি হয়, বিশেষত আজকের ভারতবর্ষে তথা পশ্চিমবঙ্গে। কারণ, বিশ্বের 'বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র' বলে কথিত এই দেশের শাসকদের কাছে জনগণের মতামত বা অভাব অভিযোগের কোনও গুরুত্বই নেই, সেগুলি তাঁরা অনায়াস ঔদ্ধত্যে উপেক্ষা করেন। জনমতকে তাঁরা কোন মূল্যই দেন না। কিন্তু জনগণকে বাদ দিয়ে যে প্রশাসনিক দমনমূলক যন্ত্র, অর্থাৎ যে পুলিশ-আমলাবাহিনী দিয়ে তাঁরা শাসন চালান, সেই যন্ত্রটির মধ্য থেকেই যদি কেউ শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার সাহস দেখান, তখন শাসকদলকে একটু নড়েচড়ে বসতেই হয়। ফলে, নজরুল ইসলামের অভিযোগ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী ও শাসকদলের নেতাদের প্রতিক্রিয়া জানাতেই হয়েছে। সে বিষয়ে যাওয়ার আগে নজরুল ইসলাম কী বলেছেন, তা সংক্ষেপে দেখে নেওয়া দরকার।

প্রথমেই একটি বিষয় বলে নেওয়া প্রয়োজন। নজরুল ইসলামের এই নিবন্ধটিকে আমরা এত গুরুত্ব দিচ্ছি শুধু এজন্য নয় যে, তিনি এ রাজ্যে সিপিএম ও পুলিশের অশুভ আঁতাতটি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছেন। আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি বিশেষ করে এই কারণে যে, তিনি নিবন্ধটিতে পুলিশ আইন, 'কোড', প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা সম্পর্কে এমন কিছু মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন, যেগুলি এদেশে এস ইউ সি আই দীর্ঘকাল ধরেই বলে আসছে।

আজ থেকে ৩২ বছর আগে ১৯৭৩ সালের ২৪ এপ্রিল এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠা দিবসে শহীদ মিনার ময়দানের এক জনসভায় এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ, তদানীন্তন কংগ্রেস শাসনে পুলিশের আচরণ সম্পর্কে বলেছিলেন, ''সেই ব্রিটিশ আমল থেকে নায়েবদের সঙ্গে, জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিশ আইনের রক্ষক হয়ে যেভাবে নিজেরা আইনকে পায়ে মাড়িয়ে যেত, সেই ঐতিহ্য আজও বজায় রয়েছে।...'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর ধরে জহরলাল থেকে শুরু করে কংগ্রেসের নেতারা গণতন্ত্র সম্পর্কে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। অথচ, একটা সাধারণ কথা, একটা দেশের প্রশাসন, বিশেষ করে তার প্রধান অঙ্গ পুলিশ, তার যদি ভদ্র আচরণ না থাকে, আইন সম্বন্ধে গুরুতর উদ্বেগ না থাকে, আপেক্ষিক অর্থে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি না থাকে, যদি জনসাধারণের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা সে পরিচালিত না হয়, তাহলে দেশে গণতন্ত্রটা থাকবে কোথায়? শুধু নেতাদের বক্তৃতায়? অথবা, ভোটের সময় নেতাদের কতকগুলো মেঠো বক্তৃতা করার মধ্য দিয়ে? এই করে গণতন্ত্র একটা দেশে টিকে থাকে নাকি?'' এরপর ৩২ বছর শুধু পার হয়ে গেছে তাই নয়, ১৯৭৭ সালের নির্বাচনের পর থেকে ২৮ বছর ধরে রাজ্যের সরকারে সিপিএম নিরঙ্কুশ ক্ষমতা নিয়ে আসীন রয়েছে। কংগ্রেস শাসনে পুলিশের ভূমিকার বিরুদ্ধে সিপিএমও যথেষ্ট সরব ছিল। ফলে তারা ক্ষমতায় বসার পর পুলিশের ভূমিকার বদল হবে, পুলিশি নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা হবে — এটা মানুষ আশা করতেই পারে। কিন্তু বাস্তবে কী হয়েছে?

নজরুল ইসলাম লিখেছেন, ''পুলিশের কাজ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করা। ...সাধারণ মানুষের স্বার্থে ... একাজ সুষ্ঠুভাবে করার জন্য পুলিশকে নিরপেক্ষ থাকা দরকার। কিন্তু ... আমাদের দেশের পুলিশ সরকারের হাতে একটা অস্ত্রের মতো। যে দল শাসনক্ষমতায় থাকে পুলিশ সাধারণত তাদের ইচ্ছেমত চলে। আইন আছে ঠিকই। কিন্তু সে আইনের নিরপেক্ষ প্রয়োগ অনেক ক্ষেত্রেই হয় না। শাসক দলের লোকেরা বিরোধী পক্ষের লোকদের তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করে।''

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বুর্জোয়াশ্রেণীর চিহ্নিত দল কংগ্রেসের আমলে পুলিশবিভাগের অবস্থা যেরকম ছিল সিপিএম নেতৃত্বাধীন 'বাম' নামধারী সরকারের আমলেও সেই অবস্থার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। মুখে মার্কসবাদের কথা আওড়াতে আওড়াতেই সিপিএম সরকার দীর্ঘ ২৮ বছরের শাসনে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুযায়ী পুলিশ বিভাগকে পরিচালনা করার কাজটাও করেনি। ঔপনিবেশিক যুগে ব্রিটিশ শাসকরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে যে 'পুলিশ কোড' তৈরি করেছিল, প্রকৃতপক্ষে সেই 'কোড' মেনেই আমাদের দেশের পুলিশ বিভাগের কাজকর্ম পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে আমাদের দল এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে 'পুলিশ কোড' পরিবর্তন করার দাবি তোলা হয়েছিল। ঐ ভাষণেই কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''আমাদের দেশের পুলিশি ব্যবস্থায় সেই ঔপনিবেশিক পুলিশি ব্যবস্থার রীতিনীতিগুলি আজও চালু রয়েছে। ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। বামপন্থীরা যখন গভর্নমেন্টে এসেছে (১৯৬৭ ও '৬৯ সালের যুক্তফ্রন্ট - স.গ.) আমি আপনাদের কাছে খোলাখুলি স্বীকার করব, বারবার আমাদের দলের মাধ্যমে আমি নানা নেতাকে এইটে বলবার চেষ্টা করেছি যে, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মাধ্যমে তাঁরা বেশি কিছু করতে পারবেন না। কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের পুলিশের আচার-আচরণে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার পুলিশি অভ্যাসগুলি আজও চালু রয়েছে সেই অভ্যাস ও আচরণগুলি তাঁরা অন্তত পাল্টাবার চেষ্টা করুন, যেগুলো একটা বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মধ্যে পাল্টানো সম্ভব।'' এ ব্যাপারে সিপিএম ফ্রন্ট সরকারের ২৮ বছরের শাসনেও অবস্থা বদলায়নি, বরং আরও খারাপ হয়েছে। নজরুল ইসলাম তাঁর প্রবন্ধে দুঃখের সঙ্গে বলেছেন — ''...বর্তমানে আমাদের দেশে যে পুলিশপ্রথা চালু আছে তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের হাতে। স্বাভাবিকভাবে এদেশের লোকদের ওপর তাদের শাসন শোষণ টিকিয়ে রাখার যন্ত্র হিসাবে তারা পুলিশকে গড়ে তুলেছিল। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু সে কাঠামোর বা কার্যপদ্ধতির তেমন কোনও মৌলিক পরিবর্তন হয়নি। শুধু বিদেশিদের জায়গায় কিছু দেশি লোক তাঁদের নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়েছেন। তাই আমাদের পুলিশ এখনও শাসকশ্রেণীর পুলিশ, প্রকৃতপক্ষে সাধারণ মানুষের পুলিশ নয়।''

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল-এর ২০০৪ সালের একটি রিপোর্ট উল্লেখ করে নজরুল ইসলাম লিখেছেন যে আমাদের দেশের সব থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত সংগঠন হল পুলিশ। ঘুষ পুলিশ প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। নানা ঘটনা তুলে ধরে তিনি দেখিয়েছেন, পুলিশ বিভাগে চাকরি জোগাড় করা থেকে শুরু করে কাজের প্রতিটি ধাপে কীভাবে ঘুষের লেনদেন চলে। এই দুর্নীতির বিরুদ্ধতা করা দূরে থাক, শাসকদল যে চূড়ান্ত দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারদেরও বিভাগের সর্বোচ্চ পদে বসাতে দ্বিধা করে না, অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে এ'কথা স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন নজরুল ইসলাম। আমাদের দেশে সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য 'প্রিভেনশন অফ কোরাপশন অ্যাক্ট, ১৯৮৮' আছে, অথচ ''দুঃখের বিষয়, আশেপাশে এত দুর্নীতি থাকলেও আমরা পুলিশ অফিসাররা এই আইনের প্রয়োগ করি না। শাসক দলের লোকেরা এবং আমাদের পুলিশের ওপরতলার লোকেরা সেটা করার খুব তাগিদ অনুভব করি না। বরং রাজনৈতিক নেতাদের, বিশেষ করে মন্ত্রীদের দুর্নীতি পুলিশের দুর্নীতিকে পুষ্ট করে।''

কিন্তু কেন সরকার পুলিশের দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নেয় না? কেন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রীরা পুলিশের অনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্বাক? এর কারণ হল, সরকারে আসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-মন্ত্রীদের অধিকাংশ নিজেরাই আকণ্ঠ দুর্নীতিতে ডুবে রয়েছে এবং সেই সমস্ত অনৈতিক কাজকর্মে পুলিশের সাহায্য তাদের একান্ত প্রয়োজন।

নির্বাচনে জিতে ক্ষমতালাভ করা থেকে শুরু করে সেই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য বহুবিধ অসৎ উপায় শাসকদলগুলিকে আজ নিতে হয়। এ সমস্ত কাজকর্মে পুলিশ শাসকদলগুলির বড় সহায়। বিশেষত বর্তমানে ক্ষমতাসীন সিপিএম-ফ্রন্ট গদি দখলে রাখার উদগ্র লালসায় পুলিশ-প্রশাসনের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ভোটে জিততে শাসক দলগুলি কীভাবে পুলিশ বিভাগকে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করে, সে কথা বলতে গিয়ে নজরুল ইসলাম বলেছেন, ''নির্বাচনের সময় পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রচণ্ড বিতর্ক আছে। এ'কথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই শাসকদলের নেতারা তাঁদের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেন। নিজেদের তাঁবেদার বলে জানা লোকদের ভোটের কাজে লাগান। নিরপেক্ষ লোকদের দূরে রাখেন। যেখানে নিজের দলের জোর বেশি সেখানে অস্ত্রহীন দুটো অস্থায়ী হোমগার্ড বা এন ভি এফ দেওয়া হয়। যেখানে বিরোধী পার্টির জোর বেশি সেখানে প্রচুর পরিমাণে সশস্ত্র পুলিশ দেওয়া হয়। বাইরে থেকে যেসব সি আর পি এফ, বি এস এফ, সি আই এস এফ প্রভৃতির লোক আসে তাদের ঠিকমত ব্যবহার না করে কোথাও নিরাপদ দূরত্বে বসিয়ে রাখা হয়। শাসকদলের লোকেরা অসৎ উপায় অবলম্বন করলেও ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। বিরোধীদের অনুরূপ প্রচেষ্টা শক্তভাবে বন্ধ করা হয়।''

শুধু নির্বাচনে জেতার জন্যই নয়; বিভিন্ন এলাকায় বিরুদ্ধ পক্ষের রাজনৈতিক দল ও তাদের অনুগামীদের শক্তি খর্ব করার জন্য গদিসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলি, বিশেষত বর্তমানে এরাজ্যে ক্ষমতাসীন সিপিএম দল কীভাবে তার ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটায়, সকলেরই তা জানা আছে। ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী মানুষদের নিজের বশে আনতে তাদের জমি-জায়গা কেড়ে নেওয়া, নৃশংসভাবে হত্যা করা, মারধোর করা, মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে জেলবন্দী করা — ইত্যাদি যেকোন ধরনের অপকর্মে আজ তারা সিদ্ধহস্ত। একাজেও তাদের বিশেষ সহায়তা করে পুলিশবাহিনী। একদিকে বিরোধীদলের নিরপরাধ নেতা-কর্মীদের নামে মিথ্যা কেস দিয়ে, সার্চ করার নাম করে তাদের ঘরবাড়ি তছনছ করে, মহিলাদের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করে এবং অন্যদিকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অনুগত গুণ্ডাবাহিনীর যাবতীয় অপকর্মের বিষয়ে চোখ বুঁজে থেকে পুলিশ সরকারি দলের প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে। এ কারণেই পুলিশবিভাগের কাকে কোন্ অঞ্চলে পোস্টিং দেওয়া হবে, সেটাও স্থির করে সরকারি দল। নজরুল ইসলাম লিখেছেন, ''বর্তমানে প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, যাঁরা সরকার গঠন করেন, তাঁরাই পুলিশের কাকে কোথায় রাখা হবে ঠিক করেন।'' ফলে, ''যাঁরা তাঁদের পছন্দ মতো জায়গায় থাকতে চান তাঁরা সেই দলের নেতাদের সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেন। নেতারা যা চান সেটা করেন। নেতারা যা চান না তা তাঁরা করেন না।'' তিনি আরও লিখছেন, ''শাসকদলের লোকদের অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ এবং দুর্নীতির ছোবল যেখানে সবথেকে বেশি, সেটা হল পুলিশের ট্রান্সফার-পোস্টিং।... কোনও ওসি-র কোনও থানার দায়িত্বে থাকা বা না-থাকা যখন সে জেলার এস পি'র উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে সেখানকার শাসকদলের নেতাদের উপর, তখন সেই ওসি শাসকদলের নেতাকে খুশি রাখার জন্যই কাজ করবেন, এস পি'র নির্দেশ মতো নয়। আবার সে জেলায় তাঁর থাকা না-থাকা যখন নির্ভর করে সেখানকার শাসকদলের নেতাদের উপর, তখন এস পি-ও কাজ করবেন সেখানকার শাসকদলের নেতাদের খুশি করার জন্য, ডি জি'র নির্দেশ মতো নয়।'' শুধু এটুকুই নয়, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল পুলিশবিভাগকে এমনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে যে, নিরপেক্ষভাবে অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার বদলে, নজরুল ইসলাম লিখছেন, ''এখন এমন অবস্থা এসেছে যে, শাসকদলের কোনও লোকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ থাকলে কোনও মামলা শুরু করা হবে কিনা, সে বিষয়ে শাসকদলের লোকদের মতামত নিতে হয়।''

সেই ১৯৭৩ সালে কমরেড শিবদাস ঘোষ তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের উদ্দেশে বলেছিলেন, ''তাঁদের (কংগ্রেস সরকারের) যে শাসনে পুলিশ সাধারণ মানুষগুলোকে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীগুলোকে ধরে আর পেটায় এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি করে ...তাঁদের সেই শাসনে তাঁরা ক'টা একচেটে পুঁজিপতিকে ... অনুরূপ কায়দায় হয়রানি করেছেন? যে একচেটে পুঁজিপতি, কালোবাজারি, মজুতদাররা সমাজজীবনকে তছনছ করে দিচ্ছে, যাদের জন্য সারা দেশ বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে যাচ্ছে, ... তাঁদের ক'জনকে তাঁরা এই কায়দায় হয়রানি করেছেন?... যে সাধারণ মানুষগুলোর কোমরে জোর নেই, যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীগুলোর কোনরকমের কোনও সহায়-সম্বল নেই, পুলিশ দিয়ে তাদের ওপর বীরত্ব ফলাতে তাঁদের নীতি আদর্শে কোথাও আটকায় না। অথচ তাঁদের যত উদারতা, যত গণতান্ত্রিক সহনশীলতা হচ্ছে একচেটে পুঁজিপতি মুনাফাখোর, মজুতদারদের ক্ষেত্রে।''

কংগ্রেস আমলে কমরেড ঘোষ যে অভিযোগ তুলেছিলেন, আজ সিপিএম-ফ্রন্টের রাজত্বেও যে সেই একই অবস্থা বহাল রয়েছে, নজরুল ইসলামের লেখায় তা স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন, ''পুলিশের ...খুব কম জনই গরিব মানুষের পক্ষে কাজ করেন। বেশিরভাগই বড়লোকের সুবিধার্থে কাজ করেন। গরিব মানুষের স্বার্থের দিকে ফিরেও তাকান না। ...দেশের আইনের বইয়ে লেখা আছে সকলের সমান অধিকার। স্বাভাবিকভাবে একই অপরাধে সমান সাজা পাওয়ার কথা। বাস্তব চিত্র অন্যরকম। একদিকে যেমন গরিব প্রভাবহীন লোকেরা আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত, অন্যদিকে

চারের পাতায় দেখুন

গ্রেডেশন প্রথার নামে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র

এ আই ডি এস ও'র প্রতিবাদ

সম্প্রতি রাজ্য সরকার মাধ্যমিক স্তরে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রেডেশন প্রথা চালু করার সার্কুলার জারি করেছে। একই সঙ্গে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল ব্যবস্থা তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাও ঘোষিত হয়েছে। এর বিরুদ্ধে দুই শতাধিক ছাত্রছাত্রীর এক সুসজ্জিত মিছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ভবনের সামনে পৌঁছালে পুলিশ মিছিলের গতিরোধ করে। ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেখানেই সভা শুরু হয়। পাঁচজনের প্রতিনিধিদল পর্ষদ ভবনে ডেপুটেশন দিয়ে আসেন।

রাজ্য সরকার যে গ্রেডেশন ব্যবস্থা চালু করতে যাচ্ছে তা কেন্দ্রের পূর্বতন কংগ্রেস, জনতা বা বিজেপি সরকারগুলির ভাবনার পরিপূরক। ১৯৮৫ সালেই তৎকালীন কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকার এক নির্দেশনামায় রাজ্য সরকারগুলিকে পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। ২০০১ সালে এন ডি এ সরকারের আমলে এন সি ই আর টি-র রিপোর্টে 'ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষাভীতি কমানোর' নাম করে দশম শ্রেণী পর্যন্ত প্রথা-বহির্ভূত ও নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছিল। ২০০৫ সালে বামফ্রন্ট সমর্থিত ইউ পি এ সরকারের আমলে এন সি ই আর টি-র পরিবর্তিত রিপোর্টে সেই কথাই বলা হয়েছে — 'পাশ, ফেল জাতীয় শব্দগুলো মুছে ফেলতে হবে।' সর্বশিক্ষা অভিযানেও এই একই নীতি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এসব কিছুর ধারাবাহিকতায় এ রাজ্যের সিপিএম ফ্রন্ট সরকার দশমশ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল তুলে দেওয়ার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত গ্রেডেশন চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অথচ রাজ্যের স্কুলগুলি যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি সহ পরিকাঠামোর ন্যূনতম সরঞ্জামের অভাবে ধুঁকছে। ছাত্র শিক্ষক অনুপাত ৪০ঃ১ থেকে বাড়িয়ে ৮০ঃ১ করা হয়েছে। একটি কক্ষে ১৫৯ ছাত্র হলেও শিক্ষক একজনই। শিক্ষকের অভাবে নামী সরকারি স্কুলগুলিতে পর্যন্ত সপ্তাহে দু'দিন-তিন দিন পর্যন্ত ছুটি দিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন কি সম্ভব? পাশফেল প্রথা বিসর্জন দিলে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার যতটুকু অবশেষ আজও আছে তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং গোটা শিক্ষাব্যবস্থাটি কব্জা করবে ব্যবসায়ী গোষ্ঠী — যারা টাকার বিনিময়ে শিক্ষা বিক্রি করবে মুনাফার উদ্দেশ্যে। যেভাবে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশফেল প্রথা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ভিত ধ্বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তা যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয় তাহলে শিক্ষার সর্বনাশ আরও বহুদূর বিস্তৃত হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পথ আরও অবরুদ্ধ হবে। শিক্ষা সংকোচনের উদ্দেশ্যে বুর্জোয়াশ্রেণীর এই চক্রান্ত প্রতিরোধে ১১ নভেম্বর এ আই ডি এস ও কলকাতা জেলা কমিটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত করে। রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও অনুরূপ কর্মসূচি পালিত হয়।

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরে ত্রিস্তর পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। আগামী জুলাই মাসে প্রথম বর্ষের বার্ষিক পরীক্ষা হবে। কলেজগুলিতে টেস্ট পরীক্ষা আসন্ন। অথচ এখনও পর্যন্ত প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা সিলেবাস জানতে না পেরে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। ত্রিস্তর পরীক্ষা ব্যবস্থা চালু করার সময় থেকেই এ আই ডি এস ও হুঁশিয়ারি দিয়ে আসছিল যে, উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে না তুলে, শিক্ষাবিদ - বুদ্ধিজীবী - ছাত্র - শিক্ষক-অভিভাবকদের মতামতের তোয়াক্কা না করে হঠকারীভাবে এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হলে এর ফল ভুগতে হবে ছাত্রছাত্রীদেরকেই। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার প্রতিবাদে এবং উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য উপাচার্যের হস্তক্ষেপ দাবি করে অবিলম্বে ছাত্রছাত্রীদের ছাপানো সিলেবাস সরবরাহ করার দাবিতে গত ১১ নভেম্বর এ আই ডি এস ও'র পক্ষ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

(ছবিঃ দুয়ের পাতায়)

ভোলকার কমিটির রিপোর্ট

একের পাতার পর

সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আর এস পাঠককে নিয়োগ করে এক সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এখানে এই প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, প্রধানমন্ত্রী যদি সত্যিই মনে করেন নটবর সিংহ নিরপরাধ, তবে তাঁকে বরখাস্ত করলেন কেন ? বলা হতে পারে, সরকারের সৎ ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থেই তাঁকে সরতে হয়েছে। কিন্তু এ যুক্তি ধোপে টিকবে না এইজন্য যে, দুর্নীতির নায়ক বলে পরিচিত লালুপ্রসাদ যাদব সহ একাধিক দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী নিয়ে যে সরকার চলছে, তার আর সততাই বা কী, ভাবমূর্তিই বা কী !

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ এবারেই নতুন উঠেছে তা নয়। এমনকী পরিচ্ছন্ন মূল্যবোধের পার্টি বলে স্বঘোষিত বিজেপি'র বিগত পাঁচ বছরের কেন্দ্রীয় সরকারি শাসনের ইতিহাসও সকলের জানা। বস্তুত চূড়ান্ত সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের বর্তমান যুগে সমস্ত পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশের শাসকগোষ্ঠীর সাথেই দুর্নীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ফলে এতে নতুনত্ব বা আশ্চর্যের কিছু নেই। একমাত্র নতুনত্ব বা আশ্চর্যের বিষয় এখানে যা, তা হচ্ছে, দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত কোনও কংগ্রেস নেতার প্রতি সি পি এম সহ তথাকথিত বাম দলগুলির সমর্থন। নটবর সিংহের পক্ষে নির্লজ্জভাবে দাঁড়িয়েছে সি পি এম নেতৃত্বে কেন্দ্রের সমর্থক বামপন্থী দলগুলিও। ভোলকার রিপোর্টে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ ওঠায়, যেখানে উচিত ছিল নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটনের দাবি তোলা, সেখানে সি পি এম তা না করে নটবর সিংহের প্রতি সমর্থনের পিছনে তাঁর মধ্যে সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা খুঁজে পেয়েছে। তারা স্পষ্টভাষায় নটবর সিংহকে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী হিরো সাজিয়ে বলেছে, ইরানের পারমাণবিক শক্তি প্রকল্পকে আন্তর্জাতিক পরমাণু কমিশনের পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার লক্ষ্যে আনীত মার্কিন প্রস্তাবে সায় দেওয়ার ভারত সরকারের নীতির বিরুদ্ধতা করেছেন বলেই মনমোহন সিংহ মার্কিন চাপের কাছে নতিস্বীকার করে নটবর সিংহকে সরিয়ে দিয়েছেন।

বিদেশি পুঁজি এবং বিশেষত মার্কিন পুঁজির 'উন্নয়নমূলক ভূমিকা'র সপক্ষে যেভাবে সি পি এম সোচ্চার, এবং যেভাবে নকল বিরোধিতার আড়ালে পশ্চিমবঙ্গে তারা ভারত মার্কিন যৌথ বিমান মহড়া চলতে দিয়েছে, যেভাবে তারা মার্কিন মদতপুষ্ট সুহার্তোর দক্ষিণ হস্ত সালিম গোষ্ঠীকে পশ্চিমবঙ্গে জামাই আদরে ডেকে আনছে তাতে দেশের বামপন্থী মানুষের কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, সি পি এম কেবল জাতীয় পুঁজির স্বার্থই দেখছে না, সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির সঙ্গেও তাদের গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গিয়েছে। তাদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা যদি যথার্থই হত, তাহলে একাজ তারা কখনই করতে পারত না। অবিচারের শিকার বলে যদি নটবর সিংহের পিছনে দাঁড়ানো তারা কর্তব্য মনে করে, তবে একই কারণে মার্কিন চাপ মেনে নিয়ে নটবর সিংহের প্রতি যারা অবিচার করল, সেই কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকারের বিরুদ্ধেও তাদের দাঁড়াতে হয়। সেক্ষেত্রে সি পি এম কিন্তু ইউ পি এ সরকারের পক্ষেই থাকছে। একই সঙ্গে ইউ পি এ সরকারকে সমর্থন দিয়ে টিকিয়ে রাখা, আবার নটবর সিংহের পক্ষে দাঁড়িয়ে নিজেদের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী বলে জাহির করার চেষ্টা — এই স্ববিরোধী অবস্থান সি পি এম-এর চরম সুবিধাবাদী দেউলিয়া রাজনীতিরই পরিচায়ক।

পুলিশে ব্রিটিশ ও কংগ্রেসের ধারাই চলছে

তিনের পাতার পর

তেমনি সমাজে যাঁরা প্রভাবশালী, তাঁরা প্রাপ্যের বেশি সুবিধা ভোগ করেন। বিচারপতি, উকিল, খবরের কাগজের লোক ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, আমলা, পুলিশ, মিলিটারি অফিসাররা আইন ভাঙলেও পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে না। অন্যায় আব্দার করলেও তা গ্রাহ্য হয়।'' সরকারি রাজনৈতিক দল ও পুলিশবিভাগের দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মীরা পরস্পরের স্বার্থরক্ষা করার মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে যে অশুভ আঁতাত গড়ে তুলেছে, নজরুল ইসলাম স্বয়ং একজন পুলিশ অফিসার হওয়া সত্ত্বেও এভাবেই অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে তা প্রকাশ করে দিয়েছেন।

নজরুল ইসলামের লেখা থেকে উপরে উল্লিখিত কয়েকটি অংশ পড়েই একজন সচেতন মানুষ বুঝতে পারবেন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ-প্রশাসন কতটা নগ্নভাবে শাসকদলের স্বার্থে ও অঙ্গুলিহেলনে চলছে এবং প্রশাসনিক দল নিরপেক্ষতা বলে কিছুই আর রাজ্য প্রশাসনে অবশিষ্ট নেই।

আমরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা জানি, পুলিশ-প্রশাসন হচ্ছে রাষ্ট্রেরই একটি 'অরগ্যান' বা অঙ্গ। ভারতের মতো একটি শ্রেণীবিভক্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে এখানে পুলিশ-প্রশাসন শেষপর্যন্ত পুঁজিবাদী শোষণের পাহারাদার সরকারের হয়ে শোষিত জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধেই কাজ করবে, জনগণের শোষণবিরোধী আন্দোলনগুলিকে দমন করার জন্য ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এই রাষ্ট্রের সংবিধানেই আবার বলা আছে, ভারত একটি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, এখানে জনগণের মতপ্রকাশের অধিকার, সভা-সমিতি করার অধিকার এবং নিজেদের পছন্দমত দল বা জোটকে সরকারে নির্বাচিত করার অধিকার রয়েছে। একইভাবে শাসকদলের বিরুদ্ধতাকারী দলকেও ভোট দেওয়ার অধিকার জনগণের রয়েছে। এই জায়গা থেকেই এসেছে প্রশাসনের দল নিরপেক্ষতার কথা। অর্থাৎ, সরকার চলবে আইন অনুযায়ী। যে দলই সরকারে বসুক, প্রশাসন সেই দলের নির্দেশে ও স্বার্থে চলবে না। আইন ও সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী চলবে। এভাবেই পুলিশ-প্রশাসনের দল নিরপেক্ষতা পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসাবেই ঘোষিত আছে। এই দলনিরপেক্ষতা যে কংগ্রেস শাসনে পশ্চিমবঙ্গে অনুসরণ করা হয়নি, তা প্রায় সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেদিন কংগ্রেস সরকারের অগণতান্ত্রিক, স্বৈরাচারী শাসনের, দলীয় স্বার্থে পুলিশ-প্রশাসনকে নগ্নভাবে ব্যবহার করার শিকার হয়েছিল রাজ্যের সাধারণ মানুষ, বামপন্থী আন্দোলন ও বামপন্থী নেতা-কর্মীরা। ফলে সেদিনের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম শরিক সিপিএম, সরকারে বসে কংগ্রেসের পথ অনুসরণ না করে গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকার চালাবে, প্রশাসনিক দল নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করবে, এটা সাধারণ মানুষ ভেবেছিলেন। বাস্তবে তা যে ঘটেনি, সেটাই নজরুল ইসলামের লেখা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল।

এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক যা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, তাতেও প্রমাণ হয় যে, পুলিশ অফিসারের তোলা অভিযোগগুলি পুরোপুরি সত্য। একজন কর্মরত পদস্থ পুলিশ অফিসার, পুলিশ কর্মচারী সমিতির পত্রিকায় সরাসরি সরকার, শাসক দল ও পুলিশ অফিসারদের দুষ্কর্মের অভিযোগ তুললেন, অথচ মুখ্যমন্ত্রী সবকিছুকেই 'বোগাস' বলে মন্তব্য করলেন। যা বুঝিয়ে দেয় এইসব অভিযোগ খণ্ডন করার ক্ষমতা মুখ্যমন্ত্রীর নেই। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকের প্রতিক্রিয়া আরও চমৎকার। প্রশাসনের কোনও পদাধিকারী না হয়েও, অনিল বিশ্বাস ছকি দিয়ে বললেন, একজন কর্মরত পুলিশ কর্মচারী হয়ে নজরুল ইসলাম কী করে এসব প্রশ্ন তোলেন বা নিবন্ধ লেখেন! এই প্রশ্ন তোলার অধিকার সিপিএম নেতাকে কে দিল? রাজ্যের সরকারে যদি সিপিএম না হয়ে অন্য দল থাকত, তাহলে অনিলবাবু কখনই একথা বলতেন না, বরং একজন পুলিশ অফিসারের এমন সাহসিকতাকে সাধুবাদ জানাতেন, এবং তিনি যেভাবে হুমকি দিয়েছেন, অন্য কোন শাসক দলের নেতা যদি সেকথা বলতেন, তৎক্ষণাৎ অনিলবাবু ঐ নেতাকে অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী বলে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতেন। অনিলবাবুর ক্ষেত্রেও একই বিচার করা হবে না কেন?

এখানেই শেষ নয়। নজরুল ইসলামের তোলা একটি অভিযোগও খণ্ডন না করে সিপিএমের দুষ্কর্মের বিরোধিতাকে অনিলবাবু ''কমিউনিজম বিরোধিতা'' বলে ধুয়া তুললেন। অথচ ঘটনা হল, সিপিএম যেভাবে সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করছে, আমলাবাহিনী ও পুলিশ-প্রশাসনকে দলের আজ্ঞাবহে পরিণত করেছে, ক্রিমিনাল ও সমাজবিরোধীদের প্রশ্রয় দিয়ে ভোটে রিগিং থেকে যাবতীয় অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে একমাত্র নিকৃষ্ট বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গেই তুলনা করা যায়। কমিউনিজমের মহান আদর্শের সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই। বস্তুত ফ্রন্ট সরকার ও সিপিএম নেতাদের যদি গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাও থাকত, তাহলে এসব গুরুতর অভিযোগ সম্পর্কে সর্বপ্রথম তাঁরা নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা করে সত্যাসত্য নির্ধারণে উদ্যোগী হতেন। তা না করে সিপিএম নেতৃত্ব নিজেরাই নিজেদের উলঙ্গ করে দিলেন।

পুলিশ কর্মচারীদের সম্পর্কেও দু'একটি কথা বলা দরকার। সকল পুলিশ-কর্মচারীই অসৎ — একথা আমরা মনে করিনা। সৎ, নির্ভীক পুলিশ কর্মীদের হয়রানির কথাও আমরা বুঝি। কিন্তু নজরুল ইসলামের লেখাই বলে দিল, রাজ্য পুলিশের একটা বড় অংশ আজ কীভাবে দুর্নীতির সাথে যুক্ত, কীভাবে সিপিএমের সমস্ত অপকর্মের শরিক হয়ে এই পুলিশ কর্মীরা সকল গণতান্ত্রিক রীতিনীতি দুপায়ে মাড়িয়ে জনগণের বিরুদ্ধে কাজ করছেন। এদের এই অপকর্মের জন্যই পুলিশ জনগণের চোখে উত্তরোত্তর ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠছে।

আজও ভিয়েতনামের মানুষ বিষাক্ত গ্যাসের প্রকোপে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্বতন সোভিয়েট ইউনিয়ন সহ পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে নাৎসি জার্মানির সামরিক অভিযান, সেখানকার ধনসম্পদ লুঠ সহ নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা, জার্মানি সহ এই সমস্ত দেশের লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের ঠাণ্ডা মাথায় গ্যাস চেম্বারে ঢুকিয়ে নারকীয় হত্যা সমগ্র বিশ্বের জনগণকে স্তম্ভিত ও মর্মাহত করেছিল। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় মানুষ ভেবেছিল এইরকমের বীভৎসতা ও নৃশংসতার ইতিহাস দুনিয়ায় হয়তো আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কিন্তু অচিরেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচার নাৎসিবাদের বীভৎসতাকেও ছাড়িয়ে গেল, যা তারা আজও বিভিন্ন দেশে সামরিক হামলা চালিয়ে ঐসব দেশের ধনসম্পদ লুঠ করে ও জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করে চালিয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নাৎসিবাদ নতুন রূপে ফিরে এলো মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের মধ্য দিয়ে।

১৯৪৫ সালের ৮ মে'র শান্তিচুক্তির কালি শুকোতে না শুকোতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পর পর আণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশু মহিলা সহ জনসাধারণকে হত্যা করে, দুটি শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। মার্কিন শাসকরা বলে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে জাপ সাম্রাজ্যবাদীদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার জন্য এই মারণবোমা ফেলা প্রয়োজন ছিল। এই মিথ্যা অজুহাত বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ গ্রহণ করেননি। সত্য হল, জাপানও তখন ছিল আত্মসমর্পণের মুখে। এই অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে আটকে বিশ্বকে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে ও প্রাচ্যে সমাজতন্ত্রের প্রভাব ঠেকাতে আমেরিকা অ্যাটম বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে খুন করেছিল।

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই জঘন্য আক্রমণ এইখানেই থেমে থাকেনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয় দেশে দেশে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপ, যার নগ্ন শিকার হয় চীন ও কোরিয়া। ১৯৪৯ সালে কোরিয়াকে উত্তর ও দক্ষিণ এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হল। দক্ষিণ কোরিয়ায় বজায় থাকল আমেরিকার সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব। উত্তর কোরিয়া সমাজতন্ত্রের পথে গেল। এর পরেই ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময়ে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদ যখন ইন্দোচীনে তথা ভিয়েতনামে তার পুরনো উপনিবেশ কায়েম রাখার জন্য সামরিক অভিযান করল তখন থেকেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে সমর্থনের নামে ভিয়েতনামে ঢুকে পড়ে। শুধু অর্থ দিয়েই নয়, আমেরিকার সামরিক প্রশাসন সবরকমের আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য করে। কিন্তু ভিয়েতনামের অবিসংবাদী কমিউনিস্ট নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে ভিয়েতনামের জনসাধারণ ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক লড়াই করে। বহু ক্ষয় ক্ষতির বিনিময়ে প্রথমে উত্তর ভিয়েতনামকে তারা মুক্ত করে। সমগ্র ভিয়েতনাম কিন্তু তখনও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্ত হয়নি। দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত হল আমেরিকার মদতপুষ্ট পুতুল সরকার, আর উত্তর ভিয়েতনামে প্রতিষ্ঠিত হল হো চি মিনের নেতৃত্বে নয়া-গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। দক্ষিণ ভিয়েতনামী জনসাধারণের সংগ্রাম থেমে থাকেনি। তারা যুগপৎ পুতুল সরকার এবং আমেরিকার সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক মরণজয়ী যুদ্ধ শুরু করে, যা আজও এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তিকামী জনসাধারণকে প্রেরণা জোগায়। ৬০-৭০ দশকে কলকাতার রাস্তা মুখরিত হত ছাত্র-যুবকদের স্লোগানে 'আমার নাম, তোমার নাম ভিয়েতনাম, ভিয়েতনাম'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যত বোমা বর্ষিত হয়েছিল, তার থেকেও কয়েকগুণ বেশি বোমা আমেরিকা কেবল ভিয়েতনামে ফেলেছে, সাথে ছিল বিষাক্ত 'নাপাম বোমা'। শিশু, গর্ভবতী মহিলা, নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা করে যখন একটা ছোট্ট দেশ দক্ষিণ ভিয়েতনামকেও মাথা নত করাতে আমেরিকা ব্যর্থ হল, তখন শুরু করল বিষাক্ত রাসায়নিক যুদ্ধ যা ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পরাজয়ের সময় পর্যন্ত চলেছে। ১৯৬১ সালের মাঝামাঝি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডির সময় এই রাসায়নিক অস্ত্র প্রয়োগ শুরু করা হয়। এই রাসায়নিক অস্ত্রের লক্ষ্য ছিল দুটি; (১) গভীর জঙ্গলে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে সেখানে মুক্তিসেনাদের আস্তানায় যাওয়ার পথ বন্ধ করা এবং (২) শস্যখেতে বিষ ছড়িয়ে মুক্তি-সেনাদের খাদ্য সরবরাহ ধ্বংস করা। পরীক্ষামূলকভাবে প্রথম এক মার্কিন বিমান চালক দক্ষিণ ভিয়েতনামের মার্কা দেওয়া একটা হেলিকপ্টার নিয়ে সাইগনের উত্তরে একটা বিস্তীর্ণ ধানখেতসহ জঙ্গলে বিষাক্ত ঐ গ্যাস ছড়িয়ে দেয়। গ্যাসের ধ্বংসের ক্ষমতায় উৎসাহিত হয়ে তৎকালীন আমেরিকার প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারা নিয়মিত এই বিষাক্ত গ্যাস-যুদ্ধ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দেন। যেসব ড্রামে এই গ্যাস ভরে রাখা হত সেই ড্রামগুলির উপর লাল নীল সবুজ ইত্যাদি রঙ করা থাকত, তার থেকে এগুলির পৃথক চরিত্র বোঝা হত। ১৯৬৫ সালে সবচেয়ে মারাত্মক যে রাসায়নিক গ্যাসটি ব্যবহার করা হল, তার ড্রামের রং ছিল কমলা। সেই অনুসারেই একে বলা হয় — 'এজেন্ট অরেঞ্জ'। ১৯৬৫ সালে এই মারণ গ্যাস দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে মার্কিন বিমান চালকরা ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে পূর্বতন দক্ষিণ ভিয়েতনামের প্রায় ৪০ শতাংশ উর্বরাজমি বন্ধ্যা হয়ে যায়। আজও সেখানে শুধু ঘাস ছাড়া আর কোন শস্য জন্মাতে পারে না। 'ভিয়েতনাম নিউজ এজেন্সি'র মতে, এই বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে কম করে ৪০ লক্ষ মানুষ। দেড় লক্ষের বেশি শিশু প্যারালিসিস, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, অন্ধত্ব প্রভৃতি নানা রোগের শিকার হয়েছে। কানাডার হ্যাটফিল্ড কনসালটেন্টস্ কয়েক বছর ধরে সমীক্ষা চালিয়ে বলেছে — 'যুদ্ধ শেষের ৩০ বছর পরেও মাটিতে, খাদ্যে, মানুষের রক্তে এবং মায়েদের দুধে এই বিষাক্ত গ্যাসের পরিমাণ আজও মারাত্মকভাবে পাওয়া যায়।' আমেরিকার টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আনল্ড ২০০৩ সালে ভিয়েতনামের মাটি পরীক্ষা করে বলেছেন, 'এই বিষাক্ত কমলালেবু রংয়ের গ্যাস নিরাপদ পরিমাণের চেয়েও ১৮০ লক্ষ গুণ বেশি আছে, যার ফলে বিষাক্ত হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্য, মাছ, মাংস প্রভৃতি। হো চি মিন শহরের এক হাসপাতালের ডাক্তার ফ্যাম থানের মতে, 'আমাদের কাছে এই বিষাক্ত গ্যাসের দ্বারা আক্রান্ত বিকৃত শিশুর জন্ম স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে গেছে। এছাড়া প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম ও অসময়ে মহিলাদের গর্ভপাতও নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।' বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, এই ধরনের মারাত্মক বিষাক্ত গ্যাসের প্রতিক্রিয়া পরিবেশ ও মানুষের দেহে বহুদিন পর্যন্ত থাকে। যার ফলে মানুষের শরীরে শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস, হজকিনের মতো নানা রোগ সহ এমনকী ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে।

প্রায় তিনবছর বাদে মার্কিন বিজ্ঞানীরা এই মারাত্মক গ্যাসের ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাসে বোস্টন শহরের ৩০ জন বিজ্ঞানী এবং ১৯৬৭ সালে ৫ হাজার বিজ্ঞানী মনুষ্যজীবন ও বনজসম্পদ ধ্বংসকারী এই মারাত্মক গ্যাসের ব্যবহার বন্ধ করার দাবি জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসনের কাছে

ছয়ের পাতায় দেখুন

আর্জেন্টিনায় বুশের মতলব ব্যর্থ

বিশ্বের পয়লা নম্বর শত্রু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের গালে সজোরে থাপ্পড় কষিয়ে দিল আর্জেন্টিনার সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী তীব্র গণ-আন্দোলন। গণপ্রতিবাদের তাড়া খেয়ে দিশেহারা, বিপর্যস্ত ও পরাজিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ শূন্যহাতে বাড়ি ফিরে গেলেন।

সমাজতান্ত্রিক কিউবাকে বাদ দিয়ে পশ্চিম গোলার্ধের ৩৪টি রাষ্ট্র নিয়ে ৪-৫ নভেম্বর আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত মার্কিন মদতপুষ্ট 'আমেরিকান মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (FTAA)' সম্মেলন চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পরিণত হল। ইতিপূর্বে, এবছরের শুরুতেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 'ক্যারিবিয়ান কনফেডারেশন'-এর সম্মেলনে FTAA পাশ করিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল এবং সেজন্য সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট পদে তারা নিজেদের সমর্থনপুষ্ট প্রার্থীও দাঁড় করিয়েছিল। কিন্তু দুটি ক্ষেত্রেই মার্কিন শাসকরা পর্যুদস্ত হয়। FTAA যেমন পাশ করাতে পারেনি, তেমনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও তাদের প্রার্থী বিপুল ভোটে পরাস্ত হয়। এই ছিল FTAA পাশ করানোর প্রশ্নে মার্কিন শাসকদের কাছে প্রথম আঘাত। দ্বিতীয় আঘাত এল আর্জেন্টিনায়।

আর্জেন্টিনা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য দেশের লক্ষ লক্ষ বিক্ষোভকারী জনগণ, বুশ এবং তাঁর বদ্ মতলবকে ছুঁড়ে ফেলে দিল আবর্জনার স্তূপে। 'দারিদ্র্য প্রতিরোধে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসনকে শক্তিশালী করার' লক্ষ্য এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য হিসাবে ঘোষণার আড়ালে প্রেসিডেন্ট বুশের আসল মতলব ছিল লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে নয়া-ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণকে আরও জবরদস্ত ও আরও বিস্তৃত করা, এবং হাইতি, চিলি ও গুয়াতেমালায় সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সেগুলিতে পছন্দের শাসক বসিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেছে, কিউবা, ভেনেজুয়েলা সহ অন্য লাতিন আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ান রাষ্ট্রগুলিতে মার্কিন স্বার্থরক্ষাকারী সেই গণতন্ত্র কায়েম করা। এই নির্মম সত্যটি বুঝে নিতে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী জনগণের অসুবিধা হয়নি। ইরাকের উপর ঔপনিবেশিক অভিযানের পক্ষে নিজের দেশের ও আন্তর্জাতিক স্তরের সমর্থন প্রেসিডেন্ট বুশ আদায় করতে পারেননি; এমনকী ইরাকের স্বাধীনতা সংগ্রামী জনগণের প্রবল প্রতিরোধ চূর্ণ করতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্যর্থ। বরং ইরাকী যোদ্ধাদের হাতে ইতিমধ্যেই দুই সহস্রাধিক মার্কিন সেনার মৃত্যু ঘটেছে। এই অবস্থায় লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠনের চুক্তি চাপিয়ে দিয়ে খানিকটা আশার আলো দেখার স্বপ্ন দেখছিলেন প্রেসিডেন্ট বুশ। ইতিপূর্বে উত্তর আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট (NAFTA)' সম্পাদন করে তিনি যে সফলতা পেয়েছিলেন, এবার সেই আশাতেই তিনি এগুচ্ছিলেন।

কিন্তু ইতিমধ্যেই উত্তর আমেরিকার অনুন্নত ও 'উন্নয়নশীল' দেশগুলির জনগণ তাঁদের জীবন নিংড়ানো তিক্ত অভিজ্ঞতার নিরিখে এই চুক্তির সর্বনাশা রূপ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। ১৯৯৪ সালে তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের আমলে যে NAFTA কার্যকরী হয়েছিল, তার লক্ষ্য ছিল ২০০৯ সালের মধ্যে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকোর মধ্যে সমস্ত বাণিজ্য প্রাচীর তুলে দেওয়া, উদ্দেশ্য — অবাধ বাণিজ্য। সেই চুক্তির পরই শুরু হয়ে যায় পুঁজির অবাধ আক্রমণ। পরিণামে তিনটি দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণের নাভিশ্বাস উঠে গেছে। শ্রমিকদের মৌলিক অধিকার, কল্যাণমূলক কর্মসূচী এবং গণ-পরিষেবা বিপর্যস্ত। শ্রমিকশ্রেণী এই আক্রমণের বিরুদ্ধে এখন সংগ্রামরত। ইকনমিক পলিসি ইন্সটিটিউট এক সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখিয়েছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মে নিযুক্ত ১০ লক্ষেরও বেশি মানুষ 'নাফটা'-র ফল হিসেবে কাজ হারিয়েছে। মেক্সিকোর শ্রমিকশ্রেণীও সমান বিপন্ন। সেখানে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রায় ৩০ লক্ষ শ্রমিক কাজ হারিয়েছে। সেখানে শ্রমিকদের আয় কমে গেছে ২১ শতাংশ, বেতনভুক শ্রমিকদের আয় কমেছে ২৫ শতাংশ। মেক্সিকোতে প্রচলিত ন্যূনতম মজুরির সাহায্যে ১৯৯৪ সালে যে-পরিমাণ দ্রব্য কেনা যেত, এখন কেনা যায় তার অর্ধেক। 'নাফটা'র প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে মার্কিন সীমান্তবর্তী মেক্সিকোয় শিল্পাঞ্চলের চারদিকে গড়ে উঠেছে অসংখ্য বস্তি এবং সেগুলিতে লক্ষ লক্ষ মেক্সিকান শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করছে। মুনাফা লুটছে মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলো। জনগণের জীবনযাত্রার মান ক্রমাগত নিচের দিকে নামছে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্বিচার লুণ্ঠনের ফল হিসেবে প্রাকৃতিক পরিবেশও ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন। এর বিরুদ্ধে গত এক দশক ধরে প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। প্রেসিডেন্ট বুশ এবার আর্জেন্টিনায় এসে মার-দেল-প্লাতা'র পথে পথে প্রত্যক্ষ করলেন, এক দশক ধরে গড়ে ওঠা জঙ্গি প্রতিরোধ আজ কত জীবন্ত ও কত সংগঠিত!

একদিকে আর্জেন্টিনার রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড গড়ে তুলে জনগণের জঙ্গি আন্দোলন এবং প্রেসিডেন্ট বুশের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো, অন্যদিকে ৩৪টি রাষ্ট্রের FTAA সম্মেলনের মধ্যে ভেনেজুয়ালার প্রেসিডেন্ট হুগো স্যাভেজ-এর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী কণ্ঠ — দুয়ে মিলে মার্কিন মতলব হাসিলের পথে প্রবল প্রতিরোধ খাড়া হয়। স্যাভেজ দাবি তোলেন, কথার চালাকি নয়, যথার্থ অর্থেই কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্যের মোকাবিলা এবং গণতান্ত্রিক শাসনকে উৎসাহদানের ব্যবস্থা করতে হবে। FTAA বিরোধী ৫০ হাজার সংগ্রামী জনগণের যে পাল্টা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হল শহরের প্রধান ফুটবল স্টেডিয়ামে, সেখানেও হাজির হয়ে স্যাভেজ প্রতিরোধ আন্দোলনের সমর্থনে তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত করলেন। তিনি সেখানে বললেন, আমরা প্রত্যেকেই হাতে বেলচা নিয়ে এসেছি, মার-দেল প্লাতা FTAA-র কবর রচনা করতে চলেছে। সেজন্য মাটি খুঁড়তে হবে।

আর্জেন্টিনায় বুশ বিরোধী বিক্ষোভ দেখে বাস্তবে মার্কিন শাসকশ্রেণীর গলা শুকিয়ে গেছে। মার্কিন বন্ধু মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট দূরে সরে গেছেন। বুশ তাঁর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করতে চাইলে তিনি দেখা করতেও অস্বীকার করেন। মার্কিন পক্ষে থাকা আর্জেন্টিনাও বুশকে কোন স্পষ্ট সমর্থন জানায়নি। হুগো স্যাভেজের উদ্যোগে যে পরিবেশ গড়ে ওঠে তাতে বুশকে সম্মেলন শেষ করতে হল কোন প্রকার চুক্তি সম্পাদন ছাড়াই।

সম্মেলন সেরে ৬ নভেম্বর বুশ যখন ব্রাজিলে পৌঁছলেন, সেখানেও তাঁকে প্রতিবাদ-আন্দোলন তাড়া করেছে। রাজধানী ব্রাসিলিয়া এবং অন্য ৬টি বড় শহরে বিক্ষোভ আন্দোলন ফেটে পড়েছে। প্রতিবাদকারীরা রাজধানী শহরে স্মৃতিসৌধ বানিয়ে বুশের ব্রাজিল সফরকে ধিক্কার জানিয়েছে। শহরের দেওয়ালে দেওয়ালে সেই ধিক্কার ফুটে উঠেছে — 'খুনি বুশ, ফিরে যাও', 'ইয়াংকি-রা ফিরে যাও'।

পানামা ছিল বুশের সফরসূচীর শেষ দেশ। সেখানেও রাস্তায় রাস্তায় প্রতিবাদী জনগণ বিক্ষোভ দেখিয়েছে, বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে। পালাবার পথ নেই, স্বস্তি পাওয়ার জো নেই, যেখানেই বুশ সেখানেই বিক্ষোভ। অবশেষে, পরাজিত বিপর্যস্ত বুশ হোয়াইট হাউসে ফিরলেন শূন্য হাতে। না, বুশ নয়, শূন্য হাতে ফিরল বিশ্ব

আটের পাতায় দেখুন

ভোট বলেই মন্ত্রী ধরা দিলেন !

শাসকদলের নেতা-কর্মীদের হুকুমে থানা-পুলিশ ও প্রশাসন কীভাবে ওঠ-বস্ করে, আইনের শাসন কেমনভাবে খুনি-লুঠেরা-ক্রিমিনালদের শাসনে পরিণত হয়, সাধারণ মানুষের কাছে সেটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাজ্যের সদ্য প্রাক্তন হওয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা নারায়ণ বিশ্বাসের ঘটনাবলী সেটাকেই আর একবার দেখিয়ে দিয়ে গেল।

সাধারণ মানুষের ঘর-বাড়ি লুঠ ও আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার অভিযোগের বিচার করতে গিয়ে আদালত মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করে ১৬ বছর আগে। মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার না করে পুলিশ জানিয়ে দেয় নারায়ণ বিশ্বাসকে 'ধরা যাচ্ছে না, তিনি ফেরার।' এরপরও ১৬ বছর ধরে নারায়ণ বিশ্বাস রাজ্যের মন্ত্রী; পুলিশ তাঁকে অনবরত সেলাম ঠুকেছে; তাঁর নিরাপত্তাবিধানের জন্য পুলিশ সর্বদাই তাঁর সঙ্গে থেকেছে। এমনকী খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেলের ঘরের পাশেই খাস কামরায় তিনি কাজ করেছেন বছরের পর বছর। তবু পুলিশ নাকি তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্য 'খুঁজে পায়নি।' আসলে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের 'গ্রীন সিগনাল' না পেলে পুলিশের পক্ষে সিপিএম নেতাকে গ্রেপ্তার বাস্তবে যে অসম্ভব, তা রাজ্যবাসী মোটামুটি বোঝেন।

অথচ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলছেন, 'নারায়ণবাবুর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানার কথা আমি যে মুহূর্তে জেনেছি, সঙ্গে সঙ্গে যা করার করেছি।' তাঁর দাবি, ঐ পরোয়ানার কথা তিনি জানতেনই না। পাশাপাশি তিনি বলেন, 'নারায়ণ কিন্তু জানত। ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এতদিন কি ঘুমোচ্ছিলেন?' (আনন্দবাজার ৮-১১-০৫) বাস্তবে, নারায়ণ বিশ্বাস এবং বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কেউই ঘুমোচ্ছিলেন না; বরং যথেষ্ট সজাগই ছিলেন এবং সবটাই জানতেন। তাঁদেরই নির্দেশ অনুযায়ী পুলিশ রাষ্ট্রমন্ত্রীকে ১৬ বছর ধরে গ্রেপ্তার করেনি। কিন্তু সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন যখন ঘোষণা করল যে, ৬ মাস বা ততোধিক কাল ফেরার হয়ে থাকা ব্যক্তিদের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হবে, তখনই তাঁদের টনক নড়েছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে ভোটে দাঁড়ানোর অধিকারটাই যে চলে যাবে! অতএব আদালতে আত্মসমর্পণ করো, ফেরার তালিকা থেকে নাম কাটাও, এবং তারপর পছন্দের বিচারপতির আদালতে মামলা তুলে কিংবা অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে জামিন নিয়ে বেরিয়ে এসো। এই হচ্ছে সিপিএমের শুদ্ধিকরণ কৌশল। এই ছকটিকে আড়াল করতে এবং নিজের 'মিস্টার ক্লিন' ভাবমূর্তি তুলে ধরতে বুদ্ধদেববাবু সব জেনেও না জানার ভান করেছেন এবং ডাহা মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে ভোটের প্রশ্ন না থাকলে ২২ কেন, ৪২ বছরেও মন্ত্রীকে যে ধরা হতনা, তাতে কেন সন্দেহ নেই।

বিহারে পশুখাদ্য কেলেঙ্কারির নায়ক লালুপ্রসাদ যাদব মুখ্যমন্ত্রী থাকার সুবাদে আইনের ঊর্ধ্বে বসেছিলেন বহু বছর। তারপর যখন পরিস্থিতি চূড়ান্ত প্রতিকূল হয়ে উঠল তখন নিজে পদত্যাগ করে স্ত্রী রাবড়ি দেবীকে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসিয়ে 'জেলে' যান। সেই জেল কিন্তু সাধারণ জেল নয়, বিহার মিলিটারি পুলিশের বিলাসবহুল এক বাংলো। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সেখানে বসেই তিনি বকলমে বিহারের সরকার ও প্রশাসন চালিয়েছেন। তাঁদের দলের সাংসদ সাহাবুদ্দিন খুন, লুঠ, অপহরণ সহ ত্রিশটিরও বেশি মামলার আসামী; জেলে গিয়েই নিজেকে অসুস্থ ঘোষণা করে জেল-হাসপাতলে আশ্রয় পান এবং সেখানেই নবাব-বাদশার মত আম-দরবার খুলে বসেন — সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ শোনার জন্য। বিহারের এই চিত্রনাট্য আমরা পশ্চিমবাংলায়ও দেখতে পাচ্ছি। ১৬ বছর ধরে গ্রেপ্তারি-পরোয়ানাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শেষপর্যন্ত আদালতে আত্মসমর্পণ করলেও নারায়ণ বিশ্বাস এবং তাদের অপর নেতা মানবেশ চৌধুরী নিজেদের 'অসুস্থ' ঘোষণা করে জেল-হাসপাতালের আরামদায়ক কক্ষে আশ্রয় নিয়েছেন। কী যে তাঁদের অসুস্থতা — আজও কেউ জানে না, এমনকী কারামন্ত্রীও বলতে পারেননি। জেল-হাসপাতালে যাবার এই ছক আগে থেকে তৈরি হয়েই ছিল। জেলে যাবার আগে কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর আলাপচারিতার যে ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে — তাতে বোঝা যায় যে জেল-হাসপাতালের প্রতিশ্রুতি তাঁদের আগে থেকেই দেওয়া ছিল। শুধু তাই নয়, ২৪ ঘণ্টা পেরতে না পেরতেই কারামন্ত্রী স্বয়ং হাসপাতালে ছুটে গিয়েছিলেন — নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রীর আদর-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি ঘটছে কিনা —তা দেখ্‌ভাল করার জন্য। এরপরও ছিল চমক — ভাইফোঁটার দিন। এদিন 'বন্দী' নেতারা ধুমধাম অনুষ্ঠান সহযোগে ফোঁটা নিলেন জেল-হাসপাতালে বসেই, তাঁদের সঙ্গে ছিলেন স্বয়ং কারামন্ত্রী, জেলাশাসক এবং মালদহ রেঞ্জের পুলিশের ডি আই জি। সংবাদপত্রে সেই ছবি প্রকাশিত হলে কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল জেলসুপারের কাছে কৈফিয়ত তলব করেছেন, কীভাবে এই ভাইফোঁটার ছবি বাইরে গেল জবাব দিন। ষোল বছর ধরে ফেরার মন্ত্রীর প্রতি সরকার ও পুলিশ-প্রশাসন কী কড়া শাস্তিরই না বন্দোবস্ত করেছেন!

সরকার ও মন্ত্রীরা জনসাধারণের উদ্দেশে প্রায়ই বলেন, আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না; আর বলেন, আইন নিজের পথেই চলবে। কিন্তু নিজেরা কী করছেন? নিজেরা আইন হাতে তুলে নিয়ে নিজেদের সুবিধামত ব্যবহার করছেন; ফলে আইন নিজের পথে চলছে না। নারায়ণ বিশ্বাসের ১৬ বছর ধরে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাকে বুড়ো আঙুল দেখানো — এর সামান্য একটি নিদর্শন।

বিদ্যুৎ, গ্যাস, সরবরাহের দাবিতে কর্নাটকে ধরনা

রান্নার গ্যাস, বিদ্যুৎ ও পানীয় জলের পর্যাপ্ত সরবরাহ সুনিশ্চিত করার দাবিতে ২০ অক্টোবর বেলারিতে জেলা কালেকটারের অফিসে অবস্থান-বিক্ষোভ প্রদর্শন করল শত শত নারী, পুরুষ, ছাত্র, যুবক। এস ইউ সি আই জেলা কমিটি আয়োজিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে জেলা সম্পাদক কমরেড সোমশেখর বলেন, সরকারের চরম গাফিলতি ও দুর্নীতির ফলেই জনজীবনে এই সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। জেলা কমিটি সদস্য কমরেড মঞ্জুলাও বক্তব্য রাখেন।

প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ গত ২৫ অক্টোবর এস ইউ সি আই প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন এবং গ্যাস ও জলসরবরাহ উন্নত করার প্রতিশ্রুতি দেন।

উত্তর বাংলাদেশ দুর্ভিক্ষের কবলে

সরকার উদাসীন, গণমুক্তির ত্রাণ বিতরণ

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মূল্যবৃদ্ধি (মঙ্গা), দুর্ভিক্ষ ও বন্যার কবলে পড়ে মানুষ অনাহারে মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ছে। ক্ষমতাসীন বিএনপি-জামাত জোট সরকারও ভারতের পুঁজিবাদী সরকারগুলির মতোই এই পরিস্থিতি যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মোকাবিলা করা দূরে থাক, মঙ্গার ভয়াবহতা স্বীকারই করতে চায়নি। এই অবস্থায় বাংলাদেশের 'গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে উত্তর বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা জেলার ৬ থানায় সহস্রাধিক অনাহারী মানুষের মাঝে ৭, ৮ নভেম্বর ত্রাণ বিতরণ ও সরেজমিনে এলাকা পরিদর্শন করা হয়। গণমুক্তির ত্রাণ টিমে নেতৃত্ব দেন বাসদ আহ্বায়ক কমরেড খালেকুজ্জামান, ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড সাইফুল হক, ৮ সংগঠনের বদরুল আলম, শ্রমজীবী মুক্তি আন্দোলনের বাবুল বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা ইউনিয়নের হামিদুল হক, এশিয়া বার্তার সম্পাদক নজরুল ইসলাম রেণু, বাসদ-এর জাহেদুল হক মিলু প্রমুখ। ত্রাণ বিতরণকালে ঐ এলাকার জনগণের যে করুণ চিত্র তাঁরা প্রত্যক্ষ করেন তা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য এবং এর প্রতিকারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে সরকারকে বাধ্য করতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান জানাতে ১০ নভেম্বর এক সংবাদিক সম্মেলন করা হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, চাল, ডালসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোলসহ জ্বালানি তেলের বার বার মূল্যবৃদ্ধি, বাস সহ সকল পরিবহণের ভাড়াবৃদ্ধি উত্তরাঞ্চলসহ সারা দেশে এক মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। মঙ্গা ছোবল হেনেছে উত্তর জনপদে। এবার আশ্বিনেই শুরু হয়েছে মরা কার্তিকের মঙ্গা। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণের মধ্যে ৮৫ থেকে ৯০ দিন উত্তরাঞ্চলের প্রতিটি অঞ্চলে কোনও কাজ থাকে না। বিকল্প কোনও কর্মসংস্থান না থাকার কারণে, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা একেবারেই থাকে না। ফি-বছরই বাংলাদেশের উত্তর জনপদের মানুষকে মঙ্গা-দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হতে হলেও রাষ্ট্র-সরকার এর স্থায়ী সমাধানে কোন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। জোট সরকার এই অবস্থার মোকাবিলা দূরে থাকুক প্রথমে মঙ্গার ভয়াবহতা স্বীকার পর্যন্ত করতে চায়নি। বিএনপি-জামাত জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী তো গত বছর মঙ্গাপীড়িত মানুষের সাথে উপহাস করে বলেই ফেলেছিলেন যে মঙ্গা কী তা তিনি চেনেন না। কিন্তু বাস্তবতা হল মঙ্গা-দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা এতটাই প্রকট যে এবারের মঙ্গা অনাহারী মানুষের দুর্দশার কথা সরকার এবং তাদের মুরুব্বি বিশ্বব্যাঙ্কও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। মঙ্গা মোকাবিলায় সরকার যতই বাগাড়ম্বর করুক না কেন চরজীবী প্রকল্পসহ নানা রং-বেরংয়ের প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেও বাস্তবে মঙ্গা মোকাবিলায় জোট সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই খাতে বাজেটে যে কথিত বরাদ্দ রাখা হয়েছিল, তা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে ছাড় না দেওয়ায় বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে এখনও কোন খাদ্য সামগ্রী পৌঁছায়নি। এর মধ্যে তিস্তা, ব্রহ্মপুত্রের চরাঞ্চলের ১০ লক্ষাধিক মানুষের পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ। শিশু, বৃদ্ধ ও নারীরা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী। মানুষ ঘরের অবশিষ্ট থালা-বাটি-ঘটি বিক্রি করে বাঁচার চেষ্টা করছে। 'গণমুক্তি ও জাতীয় সম্পদ রক্ষা সম্মিলিত আন্দোলন' মঙ্গা কবলিত অঞ্চলকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করার দাবি জানাচ্ছে।

ভিয়েতনামে বিষাক্ত গ্যাস

পাঁচের পাতার পর

একটা প্রতিবাদপত্র পাঠান।

ভিয়েতনামের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের পক্ষে রুজু করা মামলার নথিপত্র থেকে আরও জানা যায় যে, আমেরিকার অপর একটি বিজ্ঞান সংস্থার তরফ থেকেও সরকার ও প্রশাসনকে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, পরিবেশের উপর এই বিষাক্ত গ্যাসের ভয়াবহ দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব পড়ছে।

মার্কিন সামরিক দপ্তর পেন্টাগণকে বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত বেসরকারি সংস্থাগুলির মাথা র‍্যান্ড কর্পোরেশন রাসায়নিক যুদ্ধের গোটা কর্মসূচিকেই অকার্যকরি বলে রায় দেয়। তারা দেখায়, প্রথমত, মুক্তিবাহিনীর জন্য চাল সরবরাহকে এর দ্বারা আটকানো যায়নি, জঙ্গলের গোপন আস্তানাও ধ্বংস করা সম্ভব হয়নি। দ্বিতীয়ত, যেসব অঞ্চলকে টার্গেট করে এই বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো হয়েছে, সেখানকার সাধারণ নাগরিকরা এর শিকার হচ্ছে। তৃতীয়ত, এই রাসায়নিক আক্রমণ ভিয়েতনামের গ্রামীণ জনগণকে আমেরিকা ও সায়গন সরকারের বিরুদ্ধেই আরও ক্ষিপ্ত করে তুলছে।

১৯৬৯ সালে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় এই বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার বন্ধ করার জন্য একটি প্রস্তাব আসে, পক্ষে ভোট পড়ে ৮৩টি দেশের, বিপক্ষে আমেরিকা সহ তিনটি দেশ ছিল। ঐ প্রস্তাবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, ১৯২৫ সালের জেনেভা প্রোটোকল অনুযায়ী যুদ্ধে জীবাণু ও রাসায়নিক বস্তু ব্যবহার করা বেআইনি। এছাড়া, ১৯০৭ সালের হেগ কনভেনশন, ১৯৪৫ সালের ন্যুরেমবাগ ও রাষ্ট্রসংঘের সনদেরও এটা বিরোধী, কারণ ঐ সনদে যুদ্ধের সময় বেসামরিক জনগণকে রক্ষা করার কথা বলা হয়েছে।

এইভাবে জনমতের চাপের পাশাপাশি রাজনৈতিক চাপ বাড়তে থাকায় আমেরিকা ১৯৭২ সালে এই রাসায়নিক যুদ্ধ না চালাবার কথা সরকারিভাবে ঘোষণা করতে বাধ্য হলেও, কার্যক্ষেত্রে ভিয়েতনামের বুকে বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো চালিয়ে যায়। রাসায়নিক গ্যাসের অবশিষ্ট ভাণ্ডার সায়গন সরকারের হাতে আমেরিকা তুলে দেয় এবং যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করা পর্যন্ত গোপনে এই গ্যাস প্রয়োগের কাজ তারা চালিয়েও যায়। ১৪ বছর ধরে লাগাতার এই বিষ ছড়িয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিকলাঙ্গ ও বিশাল শস্যভূমি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। ২০ বছর ধরে চলা হত্যা ও ধ্বংস ১৯৭৫ সালে শেষ হওয়ার পর আরও ১৯ বছর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখে।

যুদ্ধাপরাধে অভিযুক্ত আমেরিকার কাছে ভিয়েতনামের জনগণ দাবি তুলেছে, রাসায়নিক গ্যাসে যেসব পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে, এখনও যারা এর জের বয়ে চলেছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিক আমেরিকা। ২০০০ সালে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন সফরে গেলে, ভিয়েতনামের প্রেসিডেন্ট ত্রান দুক লুওঙ তাঁকে যুদ্ধের এই বিষময় ফলাফলের দায় স্বীকার করে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণকে সাহায্য করা ও পূর্বতন সামরিক ঘাঁটিগুলি গ্যাসমুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন, কিন্তু ক্লিন্টন তার মর্যাদা দেননি। এই হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাস যার পুনরাবৃত্তি এখন আমরা দেখছি ইরাকের বুকে। আশার কথা, ইরাকি জনগণ নিজেদের প্রাণ ও রক্তের মূল্যে মার্কিন শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

উত্তর ভারত রাজনৈতিক শিক্ষা শিবির

গত ২-৪ অক্টোবর এস ইউ সি আই-এর রাজনৈতিক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয় হরিয়ানার সোনেপত শহরে। এই শিক্ষাশিবিরে দিল্লি, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, রাজস্থান প্রভৃতি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডিগড় ও মধ্যপ্রদেশের গুণা, গোয়ালিয়র, ইন্দোর প্রভৃতি এলাকার কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনা করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের উপর রচিত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিবির উদ্বোধন করা হয়। শুরুতেই দিল্লি রাজ্য সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামল বিপ্লবী আন্দোলনের প্রয়োজনে এই ধরনের শিবিরের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব তুলে ধরেন। কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের মূল নীতিগুলির উপরই প্রথম আলোচনা করেন। এরপর তিনি বিপ্লবের স্তর সংক্রান্ত আলোচনা করেন এবং বিপ্লবের রণনীতি ও রণকৌশলের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেন। সর্বশেষে তিনি বিপ্লবী পার্টি ও তার সংগঠন গড়ে তোলার মূল নীতিগুলি নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার শ্রেণীচরিত্র এবং বিপ্লবের কে শত্রু কে মিত্র তা আলোচনা করে কমরেড চক্রবর্তী দেখান, কীভাবে ভারতীয় বুর্জোয়া-শ্রেণী ক্ষমতা দখল করেছে এবং পরবর্তীকালে ব্যাঙ্কিং পুঁজি ও শিল্পপুঁজির মিলন ঘটিয়ে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। ভারত রাষ্ট্রের এই চরিত্রের কারণেই ভারতের বিপ্লবের চরিত্র হচ্ছে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক। তিনি বিস্তারিত আলোচনা করে দেখান, কোন অবস্থাতেই ভারতের বিপ্লবের চরিত্র কেন সিপিআই উদ্ভাবিত জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা সিপিএম উদ্ভাবিত জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব হতে পারেনা। বুর্জোয়াশ্রেণীকে প্রগতিশীল এবং মিত্রশক্তি হিসাবে তুলে ধরার জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব কোন যুক্তিতেই বিপ্লবের সঠিক স্তর নয় এবং এই লাইন বাস্তবে শাসক বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে। এই দলগুলি বিপ্লবের নামে কাল্পনিক শত্রু খাড়া করে লড়াইয়ের কথা বলে জনগণকে শুধু ভ্রান্ত পথেই পরিচালিত বা প্রতারিত করছে না, শ্রমিকশ্রেণীর মারাত্মক সর্বনাশও করছে।

সোনেপত শহরে মুরীউত্তর ভারত রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরে বক্তব্য রাখছেন কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তী

নেতা-কর্মীদের কাছে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী, দলের পুনরুজ্জীবন ও সংহতিসাধনের যে আহ্বান রেখেছেন তাকে অবিরাম এবং সর্বদিক ব্যাপ্ত করে চালিয়ে যেতে কমরেড চক্রবর্তী প্রতিনিধিদের স্মরণ করিয়ে দেন।

কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর আলোচনা ভাল করে বুঝে নিতে শিবিরে রাজ্যভিত্তিক যৌথ আলোচনাও পরিচালিত হয়। পরিচালনা করেন কমরেডস্ সত্যবান, হরিপ্রকাশ (হরিয়ানা), গিরিজেশ্বর সিং (রাজস্থান), অমিন্দর পাল সিং (পাঞ্জাব), সুরেশ অবস্থি, আর কে শর্মা, হরিশ ত্যাগী, সঞ্জয় (দিল্লি)। আন্তর্জাতিক সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিবির সমাপ্ত হয়।

রাঁচিতে মহিলাদের শিক্ষাশিবির

এ আই এম এস এস-এর রাঁচি জেলা কমিটির উদ্যোগে গত ২৬ অক্টোবর স্থানীয় বিধানসভা হলে এক শিক্ষাশিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে শতাধিক মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে আলোচ্য বিষয় ছিল 'বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে নারীমুক্তি কোন্ পথে।' এই শিক্ষা শিবির পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য দীপঙ্কর রায়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই-এর ঝাড়খণ্ড রাজ্য সম্পাদক কমরেড হেম চক্রবর্তী, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড রবীন সমাজপতি, এম এস এস-এর সহ-সভানেত্রী কমরেড কেয়া দে প্রমুখ।

মধ্যপ্রদেশ

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান

২১ অক্টোবর কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অর্জুন সিংহ গুণা সফরে গেলে এ আই ডি এস ও'র গুণা ইউনিট তাঁর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করে শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় বাজেটের দশ শতাংশ বরাদ্দের দাবি জানায়। উচ্চবিদ্যালয়ে গ্রেডেশন প্রথার নামে পাশফেল প্রথা বাতিলের সিদ্ধান্তের, যৌনশিক্ষা এবং জ্যোতিষ বিদ্যা চালু করার তীব্র বিরোধিতা করা হয়। সংগঠনের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টে ফি-বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আইন পাশ করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর কাছে দাবি জানান হয়। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস্ লোকেশ শর্মা, প্রদীপ আর বি, প্রীতি পতুয়ার্ধন, মুদিত ভাটনগর, শচীন জৈন প্রমুখ। ১৬ অক্টোবর এ আই ডি এস ও গুণা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শহরের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শতাধিক ছাত্রছাত্রী প্রতিনিধি হিসাবে ছিলেন। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সর্বভারতীয় কমিটির সদস্য কমরেড সুনীল গোপাল, গুণা জেলা সভাপতি কমরেড লোকেশ শর্মা প্রমুখ। কমরেড শচীন জৈনকে সভাপতি এবং কমরেড সঙ্গীতা আর বি-কে সম্পাদক করে ২২ জনের কার্যকরী কমিটি এবং ৩২ জনের কাউন্সিল গঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন কমরেড আখতার খান।

নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উদ্‌যাপিত

মহারাষ্ট্র

১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে কমরেড লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ায় সংঘটিত বিপ্লব সারা বিশ্বকে দেখিয়ে দেয় যে, বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ মেহনতি জনতা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত হতে পারে।

কমরেড লেনিনের শিক্ষার ভিত্তিতে এস ইউ সি আই-এর প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, সমাজপ্রগতির স্বার্থে সাম্যবাদী মতাদর্শগত সংগ্রাম নিয়ত ক্রিয়াশীল রাখতে পারলে সর্বহারাশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে। অন্যথায় সংশোধনবাদী নেতৃত্ব বা রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উৎখাত হওয়া পুঁজিপতিশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে। রাশিয়া, চীন এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সেই ঘটনাই ঘটেছে। সেইজন্য সঠিক বিপ্লবী দলকে শক্তিশালী করা এবং মেকি বামপন্থী দলগুলি সম্পর্কে সতর্ক থাকা শ্রমজীবী মানুষদের অবশ্য কর্তব্য।

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৮তম বর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে নাগপুরের ভুরে ভবনে অনুষ্ঠিত ৭ নভেম্বরের সভায় উপরোক্ত বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই-এর নাগপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মাধব ভোগে, এ আই ডি এস ও'র কমরেডস্ বিজেন্দ্র রাজপুত, চেতন গিরি প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন কমরেড রবীন্দ্র সাখরে।

আসাম

মহান নভেম্বর বিপ্লবের ৮৮তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে এস ইউ সি আই আসাম রাজ্য কমিটির উদ্যোগে ৯ নভেম্বর গৌহাটির ভগবতী প্রসাদ বড়ুয়া ভবনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড জয়নাল আবেদিন। প্রধান বক্তা রাজ্য সম্পাদক কমরেড কল্যাণ চৌধুরী নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, এই বিপ্লবের প্রভাব বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর উপর এত গভীরভাবে পড়েছিল যে, এরপর আরও কিছু দেশে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং শক্তিশালী সমাজতান্ত্রিক শিবির গড়ে ওঠে। কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার আলোকে কমরেড কল্যাণ চৌধুরী দেখান, কীভাবে লেনিন-স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর রাশিয়ায় এবং মাও সে-তুং-এর মৃত্যুর পর চীনে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ থেকে বিচ্যুতির ফলে এবং সংশোধনবাদী চক্রের ক্ষমতা দখলের পরিণামে প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে এই সমস্ত দেশে পুঁজিবাদ আবার ফিরে এসেছে। এই পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে আমেরিকার নেতৃত্বে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ বিভিন্ন শ্রমজীবী মানুষের উপর নগ্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিপূরক করে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য কমরেড কল্যাণ চৌধুরী আহ্বান জানান। সভার শুরুতে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সুরত জামান মণ্ডল পার্টি পরিচালিত বিপ্লবী লাইনে গণআন্দোলনগুলিকে শক্তিশালী করার আবেদন জানান। সভাপতির ভাষণে কমরেড জয়নাল আবেদিন নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে আমাদের দলের গৃহীত পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইনের সঠিকতার দিকগুলি আলোচনা করেন।

নভেম্বর বিপ্লব দিবসে গৌহাটির জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড কল্যাণ চৌধুরী

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

যৌথ বিমান মহড়া ঃ মেদিনীপুরে বিক্ষোভ

৭ নভেম্বর মেদিনীপুর জেলাশাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ

পুলিশি নৃশংসতার বিরুদ্ধে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এ বিক্ষোভ

২৭ অক্টোবর সল্টলেকে বিদ্যুৎ ভবনের সামনে অল বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি কনজিউমার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশনে পুলিশের বর্বর লাঠিচার্জ ও গুলিচালনার প্রতিবাদে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)-এর উদ্যোগে ২৮ অক্টোবর মহাকরণে বিক্ষোভ মিছিল হয়। রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের এই বিক্ষোভ মিছিল সাধারণ কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। পুলিশের নৃশংস আচরণ প্রসঙ্গে সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের 'পুলিশ যা করেছে ঠিক করেছে' এই বক্তব্যকে ধিক্কার জানাতে থাকেন তাঁরা। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গুরগাঁও-এর পুলিশি অত্যাচারের লোক দেখানো প্রতিবাদকেও ধিক্কার জানান তাঁরা। মিছিল থেকে অবিলম্বে দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়। এছাড়াও বিদ্যুতের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং পরিবহনের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহারের দাবি জানানো হয়। কর্মচারীদের বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন সমীররঞ্জন মজুমদার।

রেজাল্ট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-কম পার্ট-১-এর ফল প্রকাশ হলে মার্কশিটে এমন নজিরবিহীন অসঙ্গতি দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মার্কশিট ফেরৎ নিতে বাধ্য হয়। ফলাফল নিয়ে ছিনিমিনি খেলার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে পুনর্মূল্যায়ন করে দ্রুত ফল প্রকাশ, বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত এবং দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এ আই ডি এস ও ৮ নভেম্বর উপাচার্যের নিকট ডেপুটেশন দেয় ও বিক্ষোভ দেখায়।

বুশের মতলব ব্যর্থ

পাঁচের পাতার পর

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শিরোমণি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ।

তাহলে, কে বলে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই শেষ কথা বলবে! শেষ কথা বলবে — সংগ্রামী জনগণ এবং তারা সেটা করেও দেখাল। আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ব্রাজিল, পানামা সহ লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে গড়ে ওঠা জঙ্গি আন্দোলন, ব্যারিকেড লড়াই শুরু করে তারা স্লোগান তুলেছে — 'সাম্রাজ্যবাদ মুর্দাবাদ'। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এই লড়াই সঠিক নেতৃত্ব পেলে অনতিবিলম্বে আওয়াজ তুলবে — সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ। কারণ, সমাজতন্ত্র ছাড়া পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের কবর যথার্থ অর্থে আর কে-ই বা খুঁড়বে। যে জনগণ মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তাড়া করে ওয়াশিংটন ফিরে যেতে বাধ্য করেছে, সেই জনগণই ওড়াবে সমাজতন্ত্রের বিজয় পতাকা — শোষণমুক্ত সমাজের জয়ধ্বজা। ভারতবর্ষের শ্রমজীবী জনগণ কবে আমেরিকা মহাদেশের বীর জনগণের মতো সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জঙ্গি আন্দোলনের পথে নামবে? মেকি মার্ক্সবাদীদের সৃষ্ট সংসদীয় রাজনীতির মোহজাল ছিন্ন করে কবে সংগ্রামের ধ্বজা ওড়াবে?

ত্রিপুরায় মুখ্যমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

গত ৩১ অক্টোবর এস ইউ সি আই ত্রিপুরা রাজ্য সংগঠনী কমিটি (১) বর্ধিত বিদ্যুৎ মাশুল প্রত্যাহার (২) মূল্যবৃদ্ধিকারী ভ্যাট বাতিল (৩) শিক্ষার মান ধ্বংসকারী নোডাল ব্যবস্থা বাতিল ও ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত পাশফেল প্রথা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত বাতিল (৪) অনলাইন লটারি জুয়া বন্ধ করা (৫) আন্ত্রিক, ম্যালেরিয়া ও অনাহারে মৃত্যু বন্ধ করা (৬) শিশু, কিশোরী সহ নারী ধর্ষণ ও হত্যা বন্ধ করা এবং (৭) পঞ্চায়েত থেকে প্রশাসনের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দুর্নীতি বন্ধ করার দাবিতে হাজার হাজার মানুষের স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকপত্র মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রদান করে। কর্ণেল চৌমুহনী থেকে সুসজ্জিত মিছিল আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জয়নগর বাসস্ট্যান্ডে এলে পুলিশ গতিরোধ করে। চার-জনের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি প্রদান করতে গেলে মুখ্যমন্ত্রী কিছু কিছু দাবি বিবেচনার আশ্বাস দিলেও নীতি-সম্পর্কিত দাবিগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করেন। জয়নগর বাসস্ট্যান্ডের জনসমাবেশে বক্তব্য রাখেন কমরেডস্ শিবানী দাস ও বাবুল বনিক। বক্তারা বলেন, যে আশা নিয়ে রাজ্যের জনগণ বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছিল, সরকার তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ৬৭ শতাংশ বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানো হয়েছে, পাইপলাইনের গ্যাসের দাম একধাপে ৮০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। নোডাল ব্যবস্থায় কোশ্চেন ব্যাঙ্ক-এর মাধ্যমে সাজেশন-ধর্মী পড়া চালু করে শিক্ষার মান ধসিয়ে দেওয়া হচ্ছে, হাঁপানিয়া জেলা হাসপাতাল বেসরকারি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ফি বেসরকারি কলেজকেও ছাড়িয়ে গেছে। শহরে মাফিয়ারাজ আর গ্রামে উগ্রপন্থা সাধারণ মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।পুঁজিপতিদের স্বার্থে পরিচালিত সরকার কিছু ক্ষেত্রে সমস্যার জন্ম দিচ্ছে, কিছু ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে উদাসীন থাকছে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া জনসাধারণের সামনে আর কোন পথ খোলা নেই।মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশনে যান কমরেডস্ সুব্রত চক্রবর্তী, শেফালী ভৌমিক, অজিত দাস ও বিভূলাল দে।

মহান নভেম্বর বিপ্লব জিন্দাবাদ

জনসভা

২৫ নভেম্বর বিকাল ৪-৩০টা মহাজাতি সদন, কলকাতা

বিষয় ঃ মহান নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের সমস্যা

বক্তা ঃ কমরেড নীহার মুখার্জী (সাধারণ সম্পাদক, এস ইউ সি আই)
কমরেড নীনা আন্দ্রিয়েভা (রাশিয়া),
কমরেড হিদার কোটিন (আমেরিকা)
কমরেড খালেকুজ্জামান (বাংলাদেশ) প্রমুখ নেতৃবৃন্দ

২৫ নভেম্বর প্রকাশিত হচ্ছে

সিলেকটেড ওয়ার্কস অফ শিবদাস ঘোষ

ভল্যুম - ৩

দাম ঃ পেপার ব্যাক - ৮০ টাকা, বোর্ড বাঁধাই - ১০০ টাকা

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in